বুনিয়াদী শিক্ষার কথা

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত, এম. এ.

ও রি য়ে ণ্ট বু ক কো ম্পা নি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ

॥ ১৩৬০ ॥

দাম : তিন টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬, সাধারণ প্রেস লিমিটেড হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু



ভূমিকা

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ছয় বছর পরে ১৯৫৩ সালে বইখানির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময়ই আভাস দিয়েছিলাম যে কথাগুলি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আমার শেষ কথা নয়, ভূমিকা মাত্র। বুনিয়াদী শিক্ষার কতগুলি মূল সমস্যা সম্পর্কে আমার বক্তব্য বিস্তারিতভাবে এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিবেদন করার বাসনা আছে—সে কথা তখনই জানিয়েছিলাম। ভয় ছিল পাঠকবর্গ আমার চিত্ত বিশ্লেষণ পছন্দ করবেন না। কিন্তু তাঁরা আমাকে ভয়মুক্ত করেছেন প্রশ্রয় দিয়ে। ইতিমধ্যেই প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং আমার আরো একপ্রস্থ বক্তব্য সবিনয়ে তাঁদের সামনে তুলে ধরছি। পূর্বেই জানিয়েছিলাম যে অন্ধভক্ত হিসাবে আমি বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করিনি। আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদূর সাধ্য বিচার করতে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠতম এবং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছে। গ্রামের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আমার এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় মূল হয়েছে। যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছাবার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। কিন্তু যাঁরা কোন একটি ব্যাপার সম্পর্কে কিছু মাত্র চিন্তা, আলোচনা অথবা তথ্য সংগ্রহ না করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে অভ্যস্ত তাঁদের সঙ্গে বিবাদ অবশ্যই আছে। অবশ্য যে সব সবজান্তা পণ্ডিতেরা এরকম তুচ্ছ পুস্তক পাঠ করে নিজ নিজ অভিমত পুনর্বিবেচনা করিবেন এমন দুরাশা আমার নেই। আমি আমার বক্তব্য তাঁদেরই হাতে পৌছে দেবার আগ্রহ নিয়ে এই পুস্তক প্রকাশে অগ্রসর হয়েছি যাঁরা উপরোক্ত শ্রেণীর পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তদ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন, যাঁরা স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে গৃহীত শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপটি

জানতে এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চান। বুনিয়াদী শিক্ষা আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এবং সমগ্র ভারতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলে গৃহীত। এ শিক্ষা ব্যবস্থা যদি জাতি গঠনের পক্ষে সত্যিই উপযুক্ত না হয় তবে এক নবজাগ্রত স্বাধীন জাতির প্রথম পদক্ষেপ ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে; কারণ আজ প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন আমরা নিশ্চিন্তরূপেই জানি যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই ভবিষ্যৎ জাতিকে এক বিশেষ আদর্শে গড়ে তোলে। সুতরাং অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমাদের দ্বিধাহীন ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। অপর পক্ষে আমরা যদি আজ বুঝি যে, গান্ধীজী আমাদের সামনে বুনিয়াদী শিক্ষার যে রূপটি তুলে ধরেছিলেন তা মানবসমাজের পরিপূর্ণ বিকাশের যোগ্যতম উপায়, বর্তমান বিশ্বব্যাপী অশান্তিকে দূর করার একমাত্র পথ তবে পরাধীনতার যুগের বিকৃত পাণ্ডিত্যকে উপেক্ষা করেই আমাদের এই ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে হবে। পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাসবশে যদি পাশ্চাত্যের কোন কোন ভ্রান্তনীতিকে অনুকরণ করতে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন অবাঞ্ছিত ভেজাল মিশিয়ে থাকি তবে দৃঢ় হস্তে তা দূর করতে হবে। মোট কথা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাকে গড়ে তোলার এই প্রাথমিক স্তরে আমাদের নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে হবে এবং দৃঢ় পদে অগ্রসর হতে হবে। এই বিবেচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে এই ভরসা নিয়েই আমি আমার চিন্তাধারা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছি। যদি আমার এই আশা সফল হবার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে তবে আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করব।

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি নূতন নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ শীর্ষক প্রবন্ধটি বিনয়ভবনে থাকা কালীন ১৩৫৬ সালে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষে পাঠ করার জন্য লিখেছিলাম। 'বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাড়া আর সবগুলি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সংগঠন'

পত্রিকায়। 'শিক্ষাব্রতী'র সম্পাদক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক আমার অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানিও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আমার সহোদরপ্রতিম, শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে চাইনা।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রশ্নকে অবলম্বন করে বর্তমান পুস্তকের প্রবন্ধগুলি লিখিত। এক সময় ছিল যখন বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে গান্ধীজীর নির্দেশিত মূলনীতিকে ভিত্তি করে 'জাকির হোসেন কমিটি' যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাকেই বোঝাত। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের জাতীয় শিক্ষারূপে পরিগণিত হবার পর আমরা ডজনকয়েক বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কথা শুনতে পাচ্ছি। প্রত্যেক রাজ্য সরকারেরই এক একটি বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা আছে, ভারত সরকারেরও একটা বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা আছে। অনেক সময়ই এসকল বিভিন্ন বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মূলনীতিগুলিও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। আমি এই পুস্তকে এসকল পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা নিয়ে কোন বিস্তারিত আলোচনা করিনি; কারণ সরকারী পরিকল্পনাগুলি শিক্ষা বিভাগের কর্তা পাল্টানোর সঙ্গে সর্বদাই নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করছে এবং সর্বত্রই স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে গান্ধী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী অকৃত্রিম সংস্করণ মাত্র বলে সরবে আত্মঘোষণা করছে। গান্ধীজীর মূলনীতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে এই দাবীর যথার্থ বিচার করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। কয়েকটি মূলনীতি সম্পর্কে এই পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে, একটা বিশেষ ক্ষতিকর প্রচারকার্য চলেছে। বলা হচ্ছে গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করলে আমাদের সর্বনাশ হবে; রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ আমাদের সামনে থাকতে গান্ধীজীর শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনই নাই। ইঁহারা এই মত প্রচার করেছেন তাঁরা আরো বলেছেন যে গান্ধীজী শিক্ষার মধ্যে উৎপাদনমূলক কাজকে স্থান দিয়ে আত্মার প্রসারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের মতে এশিক্ষা কাজের মানুষ তৈরী করবে কিন্তু মানুষের

মহত্তর সত্ত্বার বিকাশে বাধা দেবে। একথাকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারিনি। যতই গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষানীতিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি ততই অনুভব করেছি যে তাঁদের মূল আদর্শ মূল চিন্তা ও কর্মধারা একই। এই পুস্তকের প্রথম দুইটি প্রবন্ধে এই মূলগত ঐক্য এবং আপত দৃষ্টিতে বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এ আলোচনা অবশ্যই সুসম্পূর্ণ নয়, এ সম্পর্কে বিস্তৃততর গবেষণার প্রচুর সম্ভাবনা ও প্রয়োজন রয়েছে। সে গবেষণা আমার কর্ম নয়, কোন পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ত কোন দিন সে কাজ করবেন। কিন্তু আমি আশা করি যে আমার বক্তব্য আমি প্রমাণিত করতে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী একই সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছেন, একই সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁহাদের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদের সৃষ্টি করে তাঁদের যুক্ত সাধনার ফললাভে, যদি জাতিকে বঞ্চিত করা হয় তবে তা চরম দুর্ভাগ্যরই বিষয় হবে।

গান্ধীজী বরাবরই বলেছেন যে বুনিয়াদী-শিক্ষা একটা সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত। আমরা কিন্তু এই মূল কথাটিকে বাদ দিয়েই সর্বত্র বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছি। গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজে সকলেরই খেটে যেতে হবে সুতরাং আমাদের নিউটন, মার্কণী, শেলী, কীটস্, রবীন্দ্রনাথ, রমণ, সত্যেন বোস হওয়ায় বাধা পড়বে এমনিতর একটা ধারণা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনে বদ্ধমূল। এটা কর্মবিমুখ বুর্জোয়া সমাজের উপরওলার লোকদের স্থানচ্যুতির ভীতি মাত্র। বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ হবার কোন বিরোধই নাই; অধিকতর বৈজ্ঞানিক এবং পক্ষপাতহীনভাবে প্রত্যেকের জন্য যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশ করাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বিশেষত্ব। অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ হলে সমাজের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটবে; কিন্তু সে পরিবর্তন কারো পথেই অবাঞ্ছনীয় হবার কথা নয়। অন্ততঃ আজ যাঁরা সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ—শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী—তাঁদের তো বর্তমান নরক থেকে মুক্তির পথ, এতে মুক্ত হবেই। তবু এটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে এই জনসাধারণের মধ্যেই আজ বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য দরদের অভাব সবচেয়ে বেশী, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা বুনিয়াদী শিক্ষার রূপায়ণে পাওয়া যাচ্ছে না।

অদৃষ্টের এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস যে নিপীড়িত জনসাধারণ ভাগ্যবানদের দিকে চেয়ে আছেন তাঁদের দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য। গণতান্ত্রিক সরকার সর্বদাই সমাজের বর্তমান অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বর্তমান সমাজে চিত্তবানদেরই প্রাধান্য। তাই জনসাধারণের প্রতি সরকারের সকল সদিচ্ছাই থাকলেও সরকারের উপর চিত্তবানদের প্রভাবই আজ সর্বাধিক। সরকার তাই জাগ্রত জনসাধারণের ব্যাপক সহানুভূতি ছাড়া গান্ধীজী পরিকল্পিত বিপ্লব সাধনে অক্ষম। জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তার এমন কি স্থানে স্থানে সক্রিয় বিরোধীতার মূলে রয়েছে অশিক্ষা পূর্বক কুসংস্কার। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজকে নিজের স্বার্থে এই ঘুমন্ত সিংহ জাগ্রত করতে হবে। জাগতিক অবস্থার চাপে বর্তমান সামাজিক কাঠামো অবশ্যম্ভাবীরূপেই ভেঙ্গে পড়ছে। এই বিপ্লবকে আমরা বরণ করি তার রক্তক্ষয়কারী রূপে না গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে। এই আজ আমাদের সামনে সর্বপ্রধান প্রশ্ন। আমরা সচেতন ভাবে গান্ধীজীর শিক্ষাকে গ্রহণ করলে অযথা রক্তক্ষরণ থেকে জাতিকে রক্ষা করা করা সম্ভব বলেই আমাদের ধারণা। 'বুনিয়াদী শিক্ষা ও ভাবী সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই মত ও পথ নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ এই যে বুনিয়াদী শিক্ষা নাকি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে তাঁতী, চাষী, ছুতোর মিস্ত্রীতে পরিণত করবে; আমাদের জগৎ-সভায় স্থান গ্রহণ অসম্ভব করে তুলবে। অনেকে তো এর মধ্যে পুঁজিবাদীদের বাঁচিয়ে রাখার গান্ধী-মার্কা চক্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন। কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষাকে শিক্ষার প্রকৃতিতম উপায় বলে স্বীকার করলেও তাই অনেকে বুনিয়াদী শিক্ষার বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা প্রথমাবধি শিশুর সামনে অনেকগুলি কাজ করতে চান, শিশু তার খুশী ও প্রবণতা অনুযায়ী যে কোন কাজ যখন খুশী করবে তাঁদের অভিমত। বুনিয়াদী শিক্ষার একটিমাত্র কাজকে কেন্দ্র করে সকল শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে এ ধারণা ভ্রান্ত; আবার বুনিয়াদী শিক্ষা কেন শিশুর খেয়ালমত যে কোন কাজ করতে দেয় না তারও যথেষ্ট কারণ আছে। 'বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পকাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দুটি দিক সম্পর্কেই বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন সম্পর্কে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও কিছু আলোচনা এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে করেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এসম্পর্কে আমার আরো বক্তব্য জমা হয়েছিল। বর্তমান পুস্তকের পঞ্চম প্রবন্ধে এসম্পর্কে আমার বক্তব্যটুকু বলার চেষ্টা করেছি।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কেবলমাত্র তত্ত্বের বিষয় নয়। সহশিক্ষা ছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অসম্ভব। এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে এবং আমাদের রক্ষণশীল সমাজের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সহশিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে স্থুরু করেছেন। ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে আমি জনসাধারণের দৃষ্টি এই সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটির প্রশ্নটি একটি বাস্তব সমস্যা। বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মীরা শিক্ষাকে নূতনরূপ দিতে গিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটির দিন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন, অথচ সরকারী ছুটির দিনের তালিকা পূর্ববৎ অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। এতে প্রচুর অস্থবিধা ও ভুল-বুঝাবুঝির স্থষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে আমি এসম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করেছি। যদি কখনও কোন সরকারী কর্মকর্তার হাতে এই প্রবন্ধটি পড়ে তবে তিনি দয়া করে আমাদের যুক্তিগুলি বিচার করে দেখবেন আশা করি।

বইখানিতে স্থানে স্থানে ছাপার ভুলত্রুটি অনেক থেকে যাবে। আমার পক্ষে প্রুফ দেখা সম্ভব হয়নি, প্রেসের বন্ধুরা এজন্য প্রচুর খেটেছেন। তাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অক্ষমতাজনিত ত্রুটি আমার। যদি স্থযোগ ঘটে তবে পরবর্তী সংস্করণে এর প্রায়শ্চিত্ত যথাসাধ্য করব।

গ্রাম-এড়গোদা
পোষ্ট-পরীহাটি
জেলা-মেদিনীপুর,
২৯।৩।১৩৬০

অনিলমোহন গুপ্ত

সূচীপত্র

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার অভিসিঞ্চনে যাঁরা সরস, রবীন্দ্রনাথের জীবনসান্নিধ্যে যাঁরা ধন্য, তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমুদ্র মন্থন করা দূরের কথা, তাঁর বিপুলদানের কণামাত্রও পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছি, একথা বলতে দ্বিধা বোধ করি। আজ যে বিষয়ে আলোচনা করার ভার গ্রহণ করেছি, সে বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার সমুজ্জ্বল বাক্যচ্ছটায়, সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজালের নিশ্ছিদ্রতায় শ্রোতৃবর্গকে সম্মোহিত করে রাখা আমার উদ্দেশ্য নয়, আর সাধ্যায়ত্তও নয়। এক হিসাবে আমার আজকার কর্তব্যটি অতি সহজ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা একদা আমার জীবনে নূতন আলো এনে দিয়েছিল, জীবনকে নূতন সুরে বাঁধবার প্রেরণা জাগিয়েছিল। সে সুরে জীবনকে মিলিয়ে নেবার প্রয়াস যতই পেয়েছি, ততই চিত্রভানুর বিচিত্র রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি গুরুদেবের রচনা থেকে। আজ আমি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

লিখতে বসিনি; শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে গুরুদেবের রচনা যা নিজে বুঝেছি, জীবনে সে আদর্শকে রূপায়িত করতে গিয়ে যে অর্থ প্রতিভাত হয়েছে আমার কাছে, তাই আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। যে অনুভূতি ছিল আমার জীবনে একান্তচারিণী, আজ তারই গুণ্ঠন খুলে ধরছি সবার সামনে; তাতে প্রকাশের দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের দ্বিধা নেই। আজ তাই এ সুযোগকে আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করছি। এ সুযোগ আমাকে দিলেন যাঁরা, তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট বলে আমার ধারণা। কোন কথা পাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, তাই তিনি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মূল বক্তব্যকে বার বার ব্যাখ্যা করে গেছেন। পরিণত বয়সে তাই তাঁকে বলতে শুনি, "যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না, কেন না অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয়নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেন না আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসিনি।"

এই বারে বারে বলা একান্ত বেদনার কথাটিকে অনুসরণ করলেই আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মূল তত্ত্বটিতে উপনীত হতে পারব, কোন্ আদর্শে শিক্ষাকে গড়ে তোলার কথা তিনি বার বার বলে গেছেন।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি বলেছেন, "এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং

সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোন সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রটি এই :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অজ্ঞানই মায়া, এই অজ্ঞানই আমাদের আত্মার সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। এই আবিলতাকে দূর করে সর্বভূতে আত্মোপলব্ধির সাধনাই শিক্ষা। শিক্ষার মন্ত্র তাই ঐক্যবোধের মন্ত্র।

এই ঐক্যের অর্থ বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি নয়।

বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে একের উপলব্ধিই সত্যের সাধনা। এই সাধনার দুইটি ধারা। বিশ্বলীলার একদিকে রয়েছে জড় প্রকৃতি, অন্যদিকে চৈতন্যের বহুধা প্রকাশ। জড় প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর আদি অন্ত নেই, ঘটনাবৈচিত্র্যের শেষ নেই। অথচ সকল বৈচিত্র্য রয়েছে নিয়মের একটি মালায় গাঁথা হয়ে। জড় বস্তুকে যখন আলাদা আলাদা করে দেখি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকি বস্তুস্তূপের অভ্রভেদী রূপ দেখে। এর মধ্যে চলতে হয় ধাক্কাধাক্কি করে, হোঁচট খেয়ে। অন্তহীন ঘটনাবৈচিত্র্যকে যখন নিয়মের সুতোয় গাঁথতে পারি না, তখন পদে পদে দোষ দেই অদৃষ্টকে, পেটের দাপটে করে চলি জড়ের দাসত্ব। পশু এই দাসত্বকে

নির্বিবাদে মেনে নেয়, যে অবস্থায় পড়ে, যে ঘটনায় জড়ায়, যে ফল লাভ করে, তাকেই স্বীকার করে নেয়। মানুষ এত নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করে না, বিদ্রোহ করে, কারণ-অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করে, অদৃষ্টকে নির্বিচারে মেনে না নিয়ে গড়ে তুলতে চায়। এই নিয়মানুসন্ধানের সাধনাই বিজ্ঞানের সাধনা। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোক এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে!" এই ঐক্যোপলব্ধির সত্যোপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে বিশ্বজয়ের রহস্য। একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষও এই জয়মাল্য গলায় পরেছিল। সেদিন প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে নিয়মের রহস্যটি ধরা পড়েছিল আমাদের কাছে, তাই জয় ছিল আমাদের করায়ত্ত। সেই কর্মস্রোতে যেদিন ভাঁটার টান এল, হাল্কা ভাবের ফানুশ নিয়ে আমরা মেতে উঠলাম। বিশ্বজগৎ এগিয়ে গেল, আমরা রইলাম পেছনে পড়ে। ঋষির উদাত্ত কণ্ঠের সাবধানবাণী 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' আমাদের মুগ্ধ কানে এসে পৌঁছল না। বস্তুর এই ঐক্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন যিনি, শক্তি দেবে তারই গলায় বরমাল্য পরিয়ে, কারণ এই ঐক্যবোধের মধ্যেই নিহিত আছে সত্য।

ঐক্যসাধনার দ্বিতীয় ধারা আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যে ভিন্নতা, যে বৈচিত্র্য রয়েছে সে মিথ্যা নয়। কিন্তু এও বিশ্বপ্রকৃতির বহিরঙ্গ। জ্ঞানের যোগে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারা আমাদের চোখে পড়ে। স্বার্থের

গণ্ডী, সমাজের গণ্ডী, ধর্মের গণ্ডী, স্বাজাত্যের গণ্ডী আচ্ছন্ন করে রাখে সত্যকে, জ্ঞান এই বিচ্ছেদের মধ্যে যোগের সূত্রটি আবিষ্কার করে। তবু জ্ঞানের যোগ পরিপূর্ণ যোগ নয়। মননের দ্বারা যে যোগ, তা আমাদের শক্তি দেয় সত্য, কিন্তু শান্তি দেয় না; নিয়মের চাবিকাঠি দিয়ে বিশ্বরহস্যের দরজা খুলে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারকে কাজে লাগিয়ে নেবার সুযোগ দেয় বটে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে আনন্দের অমৃত জোগায় না। ভারতবর্ষ যে "সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।" সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি, যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই যোগের দ্বারাই ভারতবর্ষ একদিন সমগ্র বিশ্বে উপলব্ধি করেছিল তাঁকে যিনি অদ্বৈতম্। এই সাধনার লক্ষ্য আত্মার মধ্যে বিশ্বের উপলব্ধি আর বিশ্বের মধ্যে আত্মার উপলব্ধি—বিরাটের মধ্যে, ভূমার মধ্যে আত্মার পরম স্বাধীনতা লাভ, যে স্বাধীনতাকে কোন সাময়িক বাহ্য অবস্থা বিলুপ্ত করতে পারে না।

কিন্তু তবু আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুই সাধনার ধারাই ব্যর্থ হতে চলেছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসাধনা শক্তির অহমিকায় চলেছে উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণি জাগিয়ে। তার বিশ্বগ্রাসী লোলুপতা বিরাট অজগরের মত হাঁ করে রয়েছে। আর ভারতে আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাও আজ শুষ্ক। শক্তিহীনের যে ক্ষমা সে তো ক্লৈব্য, সম্পদহীনের যে ত্যাগ সে তো কুৎসিত দারিদ্র্য। পাশ্চাত্যে আজ সত্যানুসন্ধানের, বিশ্বরহস্যের অবগুণ্ঠন খুলে তার

নিয়মবিধৃত সত্যরূপটি আবিষ্কারপ্রয়াসের স্থান গ্রহণ করেছে হিংসা, লোলুপ বর্বরতা; আর ভারতবর্ষে আজ সাত্ত্বিক সাধনার স্থান গ্রহণ করেছে নিশ্চেষ্ট দুর্বলতা, অসহায় পরনির্ভরতার নীরন্ধ্র তামসিকতা।

সাধনার এই দুধারার মধ্যে সত্যই যদি সত্য থেকে থাকে তবে এদের ব্যর্থ হয়ে যাবার কারণ কি? সত্য যদি সত্যই শাশ্বত হয় তবে সত্যসাধনার এই ধারাগুলি পঙ্কিলতার আবর্তে, আত্মবিরোধের সর্বনাশে তলিয়ে যাচ্ছে কেন?

এই ব্যর্থতার অঙ্কুর কোথায় তা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে গেছেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানসাধনা ভ্রষ্ট হয়েছে লোভের দ্বারা। "সুগমতা, সরলতা ও সহজতাই যথার্থ সভ্যতা,—বহু আয়োজনের জটিল বর্বরতা, বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল।" তাই আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকার ঐশ্বর্যের দৈত্যপুরীতে বসে কবির মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, "তালের খচমচর অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়। আরো চাই আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে, ততঃ কিম্।" বিজ্ঞানসাধনার সত্যটুকু হচ্ছে বিশ্বের লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি। এরই মধ্যে বিজ্ঞানের সার্থকতা, সাধনার সিদ্ধি। লোভ এই ঐক্যতত্ত্বের রিপু। ঐক্যবোধকে অবসন্ন করে দেয় লোভ, লোভ আনে বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, বৈচিত্র্যকে ভেঙে চুরে একাকার করার মত্ততা। তাই লোভের মধ্য দিয়েই বিজ্ঞান পথভ্রষ্ট হয়।

"বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় বলে দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই।" ভারতের তপস্যা ব্যাহত হয়েছে এই কামনার দ্বারা। তপোবনের শান্ত সরল পরিবেশের মধ্যে ঐক্যবোধের নিবিড় সাধনা ছিল। সেখানে অয়োজনের বিরলতার মধ্যে দৈন্য ছিল না, ছিল সংযম। বাইরের সংস্পর্শে আমরা সেই ঐক্যসাধনাকে, সেই চিত্তসংযমকে অব্যাহত রাখতে পারিনি। ঐশ্বর্যের চাকচিক্য দেখে আমরা লুব্ধ হয়েছি, ভারতের সংযমের আড়ম্বরহীনতাকে, উপাদানের স্বল্পতাকে দৈন্য ভেবে লজ্জা বোধ করেছি। ফলে আমরা যেমন একদিকে সেই ঐক্যবোধ, বিশ্ববোধ, আত্মসংযম হারিয়েছি, অন্যদিকে যে শক্তির সাধনা দেখে লুব্ধ হয়েছি সে সাধনাকেও আয়ত্ত করতে পারিনি।

তা হলে এই ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির উপায় কি ?

একতরফা সমাধানে এ থেকে মুক্তি নেই, এই কথাটাই গুরুদেব বারবার বলে গেছেন। বিজ্ঞানকে গাল পাড়লেই বিজ্ঞানের মধ্যে যা সত্য তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। আবার কবি-কল্পনা বলে উপেক্ষা করলেই বিশ্বোপলব্ধির সাধনা মিথ্যা হয়ে যাবে না। বৈচিত্র্যের বিলুপ্তির মধ্যে সত্য নেই, আছে সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যে।

সামঞ্জস্যবিধানের এই চরমতত্ত্বকে গুরুদেব খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদের

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং ॥

—এই মন্ত্রে। সামঞ্জস্যবিধায়ী এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি :

"পশ্চিম সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু নিন্দাটা কিসের।

"ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন, মা গৃধঃ, লোভ করো না। কেন করব না। যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাই বা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই।—ভোগ করো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কি। সত্য হচ্ছে এই ঈশাবাস্যমিদং সর্বং, সংসারে যা কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা কিছু চলছে, সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছু না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা হত। তা হলে লোভেই মানুষকে সবচেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন, এইটেই যখন শেষ কথা, তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা; আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়।"

সুতরাং বাইরের বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং ভিতরে অন্তরজগতে পরিপূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিই হচ্ছে গুরুদেবের শিক্ষার আদর্শ। বিশ্ব-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে মননের দ্বারা আমরা ঐক্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারি। এই আবিষ্কার বিরাট শক্তির উৎস। কিন্তু এই শক্তি যদি মত্ততা জাগায়, ঐক্যসাধনার পথে যদি আমরা

বিশ্বের বহিরঙ্গের সত্যটুকু জেনেই তৃপ্ত হয়ে থাকি, তবে শিক্ষাযোগের এই বিভূতি স্তরেই আত্মস্খলন ঘটে। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা পথভ্রষ্ট হয়ে অকল্যাণের আকর হয়ে দাঁড়ায়। শক্তির এই মত্ততাকে জয় করে অন্তরে বাইরে পরিপূর্ণ ঐক্যের বোধ যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তবে শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ ঘটে, উপলব্ধির এই চরম স্তরে আমরা অমৃতত্ব লাভ করি।

এ হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে গুরুদেবের 'আইডিয়া', কিন্তু 'আইডিয়া'কে উপলব্ধি করতে হলে কেবল শব্দগুলিকে বারবার আওড়ালে চলে না। তাই তিনি বলেছেন, "'আইডিয়া' যত বড়ই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

তাই গুরুদেব শিক্ষা সম্বন্ধে কেবলমাত্র তাঁর 'আইডিয়া'ই দিয়ে যাননি, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এই আইডিয়াকে উপলব্ধি করতে হলে কোন্ আদর্শে শিক্ষাবিধিকে গড়ে তুলতে হবে, তাও স্পষ্টভাবেই বলে গেছেন।

শিক্ষার কাজ হচ্ছে আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেওয়া, আত্মপ্রকাশের এই তত্ত্বটিই শিক্ষার গোড়ার কথা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটিকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে।" মানুষের এই প্রকাশতত্ত্বটি কি ? আপনার দেহের সীমার মধ্যে বদ্ধ যে মানুষ, সে পশুরই সগোত্র। দেহের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, ভিন্ন। এই ক্ষুদ্রতা মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনে বাধা দেয়। এই সীমাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিলে মানুষের আত্মপ্রকাশ দেহের আবর্তে আটকা পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকার করে এ সীমাকে মেনে নিতে, নিজের দেহের গণ্ডী পেরিয়ে মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে। সে বলে,

"যে চৈতন্য জ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে।
আনন্দ অমৃতরূপে,......"

চৈতন্যের প্রচ্ছন্নতার মুক্তি ঘটে ভালবাসার মধ্য দিয়ে, ভালবাসাই আমাদের ইঙ্গিত দেয় অন্যের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাবার পথের। ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমরা উপলব্ধি করতে পারি অন্যের মধ্যে নিজেকে। দেহের গণ্ডীকে আমরা যত ছাড়িয়ে যেতে পারি,

ভালবাসার মধ্য দিয়ে, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ যত বেড়ে যায়, ততই আমাদের আত্মা আবিলতামুক্ত হয়। তাই ভালবাসা শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে গুরুদেব বলেছেন, "মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-শক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি শিক্ষাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি।" শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ আমরা দেখছি অত্যন্ত বিদ্যার বাণিজ্য। ঘণ্টা মিলিয়ে ওজন করে শিক্ষার পণ্য বিনিময় চলে আজকাল বিদ্যালয়ে; খুশির দান এর চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকায় যে খুশি জন্ম, সে খুশি আত্মার বন্ধনমুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। এ আনন্দের উদ্ভব কেবলমাত্র কর্তব্যবোধ দ্বারা সম্ভব নয়, জ্ঞানের দ্বারাও সম্ভব নয়—এর জন্য প্রয়োজন জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ, গুরুশিষ্যের মধ্যে কেবলমাত্র সামীপ্য নয়, 'সাযুজ্য ও সাদৃশ্য'।

কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে অন্তরের এই যোগ যথেষ্ট নয়। যে ভালবাসা গুরুশিষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সে ভালবাসা পঙ্গু। চিত্রকে সার্থক করতে যেমন পটভূমির প্রয়োজন, তেমনি বিদ্যালয়ের সার্থকতাও সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে। যেখানে সমাজের দৈন্য, কুৎসিত পঙ্কিলতা, দুর্বহ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিদ্যালয় নিরুৎসুক, সেখানে বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে গুরুশিষ্যের যে ভালবাসা, তা কৃত্রিম হওয়ারই সম্ভাবনা। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "এমন কোন কোন গ্রহ উপগ্রহ আছে, যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য

অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্য-বিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশী প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলেছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।" এই আত্ম-বিচ্ছেদই শিক্ষার যূপকাষ্ঠ, ঐক্যবোধের বিরুদ্ধ স্রোত। তাই শিক্ষা সম্পর্কে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে এই যে শিক্ষার ক্ষেত্র হওয়া চাই দেশজোড়া আর শিক্ষাকার্যের মধ্যস্থ হওয়া চাই ভালবাসা।

মানুষের এই প্রকাশতত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ 'কর্মের মধ্যে' প্রচলিত করার কথা বলে গেছেন। এই কথাটি আর একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। বিশ্বচরাচর থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখার মধ্যেই অহংকারের জন্ম। এ অহংবোধ আমাদের বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা দিয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কারারুদ্ধ করে রাখে। অহং-এর এই কারা থেকে মুক্তি পাবার একটি মাত্র উপায় আছে, সে হচ্ছে জীবনযাত্রার বেড়াগুলি ভেঙে ফেলে কর্মের মধ্য দিয়ে অন্যের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন। কথার ফুলঝুরিতে জীবনের সঙ্গে সত্যকার যোগস্থাপন সম্ভব নয়—সে হচ্ছে কবির ভাষার 'সৌখীন মজদুর'।

'জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।'

এই জীবনে জীবন যোগ করতে হলে জীবনযাত্রার কৃত্রিম বেড়াগুলি ভেঙে ফেলার প্রয়োজন যে কতখানি, তা গুরুদেবের আক্ষেপোক্তি থেকেই আমরা সব চাইতে ভাল অনুভব করতে পারি,

কতবার গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে সাধ্য ছিল না একেবারে।

কেন, বাধা কিসের? কবি বলেছেন,

বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে 'সহকারিতার সখ্য বিস্তার'। সহকারিতাই মানুষের সুখদুঃখের নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। তাই গুরুদেব শিক্ষার গোড়ার কথা হিসাবে সহজীবনকে, সামাজিক কর্তব্যবোধকে এত বড় আসন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "নিজের চারিদিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্রবাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এ বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত।" কর্মের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের সঙ্গে, সমগ্র দেশের সঙ্গে যোগস্থাপন করা কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। এই কঠিন কর্তব্যকে এড়াবার প্রয়াসে আমরা অনেক সময় বাক্যের ইন্দ্রজাল রচনা করি। 'সাম্য' 'সমান সুযোগ' প্রভৃতি কথা আজকাল মুখের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয়ে আমরা শিখি 'সদা সত্য কথা বলিবে', মুখস্থ করতে শিখলেই শিক্ষালাভ

সম্পূর্ণ হয়ে গেল। সে শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য যে সত্য কথা বলবার প্রয়োজন আছে, এ বোধ শিক্ষালয়ে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে দেবার কোন প্রচেষ্টা হয় না। ফলে শৈশবেই আমাদের জীবনে কর্মে ও বাক্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটে। এ বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়ে যায় আমাদের জীবনে। কর্মে ও বাক্যে এই চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ রয়েছে আমাদের সর্ব আত্মপ্রবঞ্চনার মূলে। এই আত্মপ্রবঞ্চনাই আমাদের জীবনকে কুশ্রী ও মলিন করে তোলে। এই জড়তার মালিন্য থেকে জীবনকে মুক্ত করতে না পারলে ভালবাসা জাগ্রত হতে পারে না আমাদের মনে; অন্যের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা আমাদের চিত্তে রেখাপাত করতে পারে না। এই বোধের অভাবেই আমরা মেথর মুচি নাপিত ইত্যাদি জাতের সৃষ্টি করেছি; তার ফলে তাদের, দেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কতখানি সর্বনাশ করেছি তা ভাবতে পারিনি। নিজেদের আপাত সুবিধার জন্য সমাজের এক অংশকে পঙ্গু করে ফেলেছি; সে ব্যাধি যে আমাদেরও পঙ্গু করছে, সে কথা ভাবার অবকাশ হয়নি। কথার সঙ্গে কাজের-সংযোগ আমাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয়নি বলে আমাদের যারা একান্ত কাছের তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েনি, অথচ বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের মৌখিক প্রচেষ্টা আমরা করেছি। রবীন্দ্রনাথ বরাবর এই একান্ত ঘরের লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর ভাষায়, "সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র্য সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে মরণ-দশা তার বুকে নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখ দারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনী-

শক্তিকে জীর্ণ জর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে—অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়।" তাই কর্মের মধ্য দিয়ে বাল্যকাল থেকেই কর্তব্যকে সহজ করে নিয়ে প্রকৃত আত্মপোলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়াকে গুরুদেব শিক্ষার অন্যতম আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। তাই গুরুদেব সবাইকে আহ্বান করেছেন কর্মশালার দ্বারে, ডাক দিয়েছেন জীবনকে দিয়ে জীবনকে বুঝতে, কর্মের মধ্য দিয়ে বোধকে জাগ্রত করতে। এটা তাঁর শিক্ষাদর্শের গোড়ার কথা।

আত্মোপলব্ধির এই প্রয়াসের সার্থকতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শিক্ষালয় যখন বিদ্যালয়ের দেয়ালগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, চোখের একমাত্র কাজ যখন হয় পাঠ্য পুঁথির পাঠোদ্ধার, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিশ্চল করে কায়মনোবাক্যে পণ্ডিতমশাইর ব্যাখ্যানের অর্থোপলব্ধিই যখন হয় শিক্ষা—তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ঘটে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের ফলে বিজ্ঞানের অজস্র পুঁথি পাঠ করা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আমাদের মনে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। তাই বিজ্ঞানের পুঁথিগত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কুসংস্কারের ভূত আমাদের ঘাড়ের উপর চেপেই বসে থাকে; নিয়মের ঐক্য-সূত্রটি মুখস্থ থাকলেও আত্মস্থ হয় না। এজন্য প্রকৃতির কোলের উপর আকাশ বাতাস গাছ পালার সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তররহস্য জানবার পাঠ নেবার কথা গুরুদেব বলে গেছেন। এই তাঁর তপোবনের আদর্শ। "......আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের অব্যবহিত সম্পর্ক লাভে উৎসুক হয়ে

থাকবে ; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে । এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বাইরের সীমানা পেরিয়ে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।" শিক্ষা যান্ত্রিক নয়, জৈব, এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই জৈব সম্পর্ককে উপলব্ধি করার জন্য বিদ্যার্থীর মুক্তি প্রয়োজন বিশ্বের মধ্যে। "ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, সহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।" তাই তিনি চেয়েছেন শিশুকে নিরাবরণ নিরাভরণ করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জুটিয়ে দিতে। তাতেই স্থাপিত হবে প্রাণের যোগ, তখনই বিশ্বপ্রকৃতি তুলে ধরবে তার রহস্যের অবগুণ্ঠন, তাতেই হবে বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

বিজ্ঞানকে ভ্রষ্ট করে লোভ। বিজ্ঞানের সার্থকতা উপকরণের স্তূপীকরণে নয়, বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে নিয়মের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করায়। ঐক্যবোধই শিক্ষালয়ের মন্ত্র। লোভ এই ঐক্যবোধের শত্রু। উপকরণের মোহে মানুষ যখন ঐক্যবোধকে ব্যাহত হতে দেয়, তখনই সুরু হয় বিজ্ঞানের চতুষ্পথে এসে দাঁড়াবার পালা ললাটে পণ্যের ছাপ এঁকে নিয়ে। "সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক।...বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই অল্প কিছু উপকরণ যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়,

তাই দিয়ে সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।” গুরুদেবের এই বাণীটিকে ভালভাবে বুঝবার ও কার্যকরী করবার চেষ্টা করলে আমরা বিজ্ঞানকে তার ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারি। বিজ্ঞানের মধ্যে যা সত্য, যা শক্তি, তা হচ্ছে বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি। এ উপলব্ধির জন্য প্রকাণ্ড যন্ত্র, প্রচুর উপকরণ ইত্যাদি প্রধান প্রয়োজন নয়। প্রকাণ্ড যন্ত্রের তুলনায় প্রাণচঞ্চল জীবকোষ একান্তই ক্ষুদ্র, নিতান্তই জটিলতাহীন। তবু বৈজ্ঞানিক নিপুণতার দিক থেকে জীবকোষটি অনেক বেশী সার্থক, কারণ সম্পূর্ণতা এখানে সরলতার অঙ্গীভূত হয়ে আছে। বিশ্বের ঐক্যকে উপলব্ধি করার জন্য স্থানবিশেষে যন্ত্রের সার্থকতা অস্বীকার করছি না। কিন্তু যন্ত্র যদি এই ঐক্যোপলব্ধিকে ব্যাহত করে তবে সেইযন্ত্রকে চুরমার করে দেবার মত নির্মমতারও প্রয়োজন আছে। পরমাণুর শক্তির আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের নিয়মতন্ত্রের একটি মস্ত বড় সূত্র আজ আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। প্রকাণ্ড যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এ সূত্র আমাদের কাছে ধরা পড়ত কি না জানি না, অন্তত জটিল যন্ত্রকে অবলম্বন করেই এ সূত্র আমাদের আয়ত্ত হয়েছে। এই সত্য আবিষ্কারের মধ্যে যে সার্থকতা, তাকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। কিন্তু এই সত্যকে, এই উপলব্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে আজ আণবিক বোমা। এই উপকরণটি আজ ঘা দিচ্ছে বিশ্বমানবের ঐক্যবোধের মূলে, মানুষের সৃষ্টি আজ মানুষকে চেপে ধরতে উদ্যত। এভাবে উপকরণের কাছে ঐক্যকে, সত্যকে বলিদানের উদাহরণের অভাব নেই। পায়ের সজীবতা

থেকে গাড়ী আজ বড় হয়ে উঠেছে, স্বাস্থ্যের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে ভোজনের আড়ম্বর, আশ্রয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে গৃহের সাজসজ্জার স্তূপীকৃত উপকরণ। তবু আজ মানুষের লোভ, নিজের স্রষ্টার প্রতি মোহ মানুষকে নিজের হাতে নিজের অক্ষম সৃষ্টিকে ভেঙ্গে ফেলার নির্মমতা দিচ্ছে না। এইখানেই বিজ্ঞানের পরাজয়। "যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।" মূঢ়তার এই প্রমত্ততা আজ আমাদের গ্রাস করছে, তাই আমাদের সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হতে চলল। সে সৃষ্টিই সার্থক যা আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক। এ সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশ নয়, শক্তির প্রকাশ নয় ; ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ এর সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। গুরুদেব তপোবনের শান্ত পরিবেশে শিক্ষাকে স্থাপন করে তাকে কল্যাণ-কর্মে নিয়োজিত করার আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন। সকলের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের মধ্যেই শিক্ষার সত্য নিহিত আছে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য ও সকলের মঙ্গল যে একই সুরে বাঁধা তার উপলব্ধির মধ্যেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা বিশ্বনিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। শরীরের জন্য যে খাদ্যটি প্রয়োজন ঠিক তাই শরীরকে না জোগালে, শরীর আপত্তি জানায়, ভেঙ্গে পড়ে। পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা করবার জন্য প্রতি পদে বিশ্বনিয়মের জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এসব ছোটখাট জিনিসকে উপেক্ষা করে ল্যাবরেটরী গড়ার প্রয়াসকেই বিজ্ঞান বলতে অভ্যস্ত। ল্যাবরেটরী গড়ার কোন

প্রয়োজনই নেই তা বলছিনে। কিন্তু রান্নাঘরও যে ল্যাবরেটরী, ঝাঁট দেওয়ার মধ্যেও যে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজন পুরামাত্রায় আছে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান যদি সত্যই আমাদের শিক্ষণীয় হত, তবে বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে রাত জেগে দেহপাত করে পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া পাপ বলে গণ্য হত, পরীক্ষায় ফেল করার জন্য এরকম ব্যবহারই যথেষ্ট হওয়া উচিত। বিজ্ঞান আমাদের বোধে, আমাদের চিত্তবৃত্তির গঠনে, মুখস্থ করা বিদ্যায় নয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে কার্যকর করে তোলা ও নিপুণভাবে ব্যবহার করার শিক্ষার উপরই বিজ্ঞানের ভিত্তি। সেজন্য শিক্ষালয়কে জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগে আনবার প্রয়োজন আছে। বাইরের উপকরণ বড় হয়ে উঠলে অন্তরের নৈপুণ্য চাপা পড়ে, জীবন জড়তায় পঙ্গু হয়ে উঠলে অন্তরের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়—এই সত্যটিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকার করে নিতে হবে।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য,এ কথা আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি। কিন্তু এই যোগসাধন যে আত্মবিলুপ্তি নয়, এ কথাটা আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার। সাত্ত্বিকতার এবং তামসিকতার বাইরের রূপটা অনেকখানি একরকম। আত্মদান যেখানে পরনির্ভরতাপ্রসূত সেখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তামসিক, আত্মদানকে মহিমোজ্জ্বল করার জন্য আত্মকর্তৃত্ব একান্ত অপরিহার্য। সে মানুষই যথার্থ ভালবাসতে পারে, যে কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। প্রত্যাশা ভালবাসাকে কামনায় পরিণত করে, কামনা চিত্তসংযমকে নষ্ট করে আত্মবিকৃতি ঘটায়। সুতরাং শিক্ষার আদর্শ

যদি হয় তেমন মানুষ সৃষ্টি করা, যারা কিছু প্রত্যাশা না করে ভালবাসতে পারবে, ভালবাসার মধ্যে, নিষ্কাম আত্মদানের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, আত্মার আনন্দ, মনুষ্যত্বের অমৃতত্বলাভ এ কথা উপলব্ধি করতে পারবে, তা হলে সে শিক্ষাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

আজকাল শিক্ষায় স্বাবলম্বনের প্রশ্ন নিয়ে একটা হৈ চৈ চলছে। বহু পূর্বে গুরুদেব এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত দিয়ে গেছেন। শিক্ষাকে স্বাবলম্বী হতে হবে, আমাদের দেশ গরীব বলে নয়, শিক্ষাকে ক্ষুদ্রতা থেকে রক্ষা করতে হবে বলে, মনুষ্যত্বকে দুর্বলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে বলে। শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আত্মোপলব্ধি; আর দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, পরাধীনতা হচ্ছে আত্মার বিকার। নিম্নোক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে আশা করি আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্, আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট মাপ মতো রূপ নেবার জন্য কর্দমাক্তভাবে প্রস্তুত।"

এরও অনেক আগে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে পড়া, 'The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটিতে গুরুদেব বলেছেন, "The one practical question which has to be answered, before all else, is the economic question—what adjustments should be made, whereby such institutions can natur-

ally maintain themselves and one day become independent, not only of the patronage by the rich, but the dead imposition of their own accumulated funds. The wealth and honour which once for all, are bequeathed to us, which we do not have to earn or produce, which never cease to be, whether we deserve them or not—these gradually and inevitably cripple our life and are sure to make us indolent and exclusive, bringing about stagnation of soul."

আত্মাকে এই স্থবিরতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য, প্রতিনিয়ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রাণকে সজীব ও পরিপূর্ণ রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় স্বাবলম্বনের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। স্বচেষ্টার দ্বারা আত্মা স্বরাট্ হবে এইটেই তাঁর অভিপ্রেত। তাই তিনি বলেছেন.

'Our truly national organisation should be made to earn its own necessities by its constant efforts, and then perpetually keep in real touch with the life of the future age and not continue its existence as a parasite feeding upon the charity of the past.'

'.... It must not only instruct, but live, not only think but produce .... It must cultivate land, breed cattle, to feed itself and its students, it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials calling science to its aid. Its very

existence should depend upon the suceess of its industrial ventures carried out on a co-operative principle, which will unite the teachers and the students in a living and active bond of necessity. This will give us also a practical industrial training, whose motive force is not greed of profit.

গুরুদেবের সুস্পষ্ট অভিমতের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শুধু একটা কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এর মধ্যে উপার্জনকরী শিক্ষাটাকেই গুরুদেব বড় করে দেখেননি। আত্মাকে স্বরাট্ করার শিক্ষা হচ্ছে স্বাবলম্বী শিক্ষা। নিজের কাজ নিজে করে নেবার শক্তি, নিজের অন্নের ব্যবস্থা নিজের হাতের আনন্দময় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজে করার শিক্ষা আত্মাকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করার শিক্ষা। এই শিক্ষায় নিজেকে যেমন শক্তিমান করে তোলে, তেমনি পরস্পরের সঙ্গে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ এনে দেয়। আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠা এর পরিণতি মাত্র।

একটি কথা ইচ্ছা করেই আমি প্রথমে উল্লেখ করিনি—সে হচ্ছে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে গুরুদেবের আদর্শ। শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে হলে মাতৃভাষাকে বাহন করার প্রয়োজন আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু গুরুদেব যখন এ নিয়ে আলোচনা সুরু করেন, তখন বিষয়টা সার্বজনীন তো ছিলই না, সহজ কিংবা স্বাভাবিকও ছিল না। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কথাটা স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করলাম।

আমার বক্তব্য এইখানেই ফুরাল। পরিশেষে একটা নিবেদন আছে। আমার বুঝবার মধ্যে ভুল থাকতে পারে; আমি গুরুদেবের শিক্ষার আদর্শকে যে চোখে দেখেছি, তার যথার্থ্য সম্পর্কে দ্বিমত থাকা সম্ভব। কিন্তু সত্য যাই হক, আমরা যাকে গুরুদেবের শিক্ষাদর্শ বলে মনে করি, তাকে রূপায়িত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি কি না সে সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমাদের শিক্ষালয় must not only instruct but live, not only think but produce এই মন্ত্রে উদ্বোধিত হক, গুরুদেবের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্রত আজ আমরা আবার নূতন করে গ্রহণ করি, এই আমার কামনা।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী—একজন সাহিত্যিক আর একজন রাজনীতিক। একজন রাজনীতিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছেন, জনসাধারণ যখনই তাঁকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে গেছে তিনি তখনই ডুব দিয়েছেন আশ্রমের নির্জনতায়, কাব্যের গভীরে। আর একজন রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন জীবনের মণিকোঠায়, আমৃত্যু ব্যস্ত রয়েছেন রাজনীতির ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিয়ে। একজন মনের আনন্দে দীর্ঘকাল লিখে গেছেন ; তিনি পৃথিবীর কবি পৃথিবীর সব সুর তাঁর কাব্যের বাঁশীতে বেজে উঠবে—এই ছিল তাঁর আশা। আর একজন বোধ হয় লিখবার আনন্দে একটি ছত্রও লেখেননি—নিজের সমস্যার চুলচেরা বিচার করা, অন্যের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা ছিল তাঁর লিখবার একমাত্র উদ্দেশ্য। একজনে ভাষা লাবণ্যে সুষমায় অলঙ্কারে অনন্যা ; আর একজনের নিরলঙ্কার ভাষা দৃঢ়তায় স্বচ্ছতায় অপূর্ব। একজন একান্ত বিশিষ্ট ; সহস্রের মধ্যে তাঁকে দেখলেও মনে হত, তিনি সকলের মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি জনতার স্বগোত্র নন। আর একজন নিতান্তই সাধারণ ; জনসঙ্ঘের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে ডুবে হারিয়ে যেতে তাঁর কোন অসুবিধাই ছিল না ; তিনি যেন জনতারই একটি স্বাভাবিক অংশ। বাইরের দিক থেকে চোখ বুলিয়ে দেখতে গেলে এঁদের মধ্যে আকারে-প্রকারে, বেশ-ভূষায়, ভাবভঙ্গিতে-ভাষায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনৈক্যটাই বড় হয়ে চোখে ঠেকবে।

কিন্তু এই আপাতবৈষম্য সত্ত্বেও একটা গভীর ঐক্য ছিল দুজনার মধ্যে। ভারতের এই দুটি শ্রেষ্ঠ মানব ভারতের একই মর্মবাণীকে উদ্ঘাটন করেছেন বিশ্বজনার কাছে। বিশ্ব-সংস্কৃতির দীপান্বিতার উৎসবে ভারতের যেদিন জ্বালাবার কোন দীপ ছিল না, বিশ্বজগৎ যেদিন সুপ্রাচীন সভ্যতার এই বিরাট কঙ্কালের দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে চেয়ে ছিল, সেদিন এঁরাই দুজনে মিলে ভারতকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তার বিশিষ্ট সংস্কৃতির আলোকটি জ্বেলে বর্তমানের ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যে তাকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। এঁদের গানে, এঁদের কর্মে বিশ্বজগৎ শুনতে পেয়েছিল চিরন্তনী সভ্যতার বাণী। জীবনের বিচিত্র প্রবাহের রূপ তাঁরা এই আদর্শের আলোকে সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতামতের তুলনামূলক আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই আলোচনা একান্ত দুরূহ কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের প্লাবনে আমরা প্লুত হয়ে আছি। এঁদের রচনা, এঁদের জীবনবাণী আশৈশব আমাদের উন্মাদ করে তুলেছে, আমাদের ভাবাবেগকে চঞ্চল করেছে। নিস্পৃহ নিরপেক্ষভাবে এঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা একান্তই সুকঠিন। অথচ আবেগকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার অসম্ভব। তবু এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, কারণ এ ছাড়া অনুকরণ করা চলতে পারে, সচেতনভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এঁদের সাধনা আমাদের মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করার সাধনা—আমরা সাহস করে এগিয়ে না এলে সে সাধনার ফলভোগ থেকে বঞ্চিত হব।

আলোচনা আবেগদুষ্ট হবার আশঙ্কা ছাড়া আর একটি আশঙ্কা আছে। এই দুই সত্যসন্ধানী দীর্ঘকাল ধরে জীবনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন সত্যের সন্ধানে। যা-কিছু তাঁরা পেয়েছেন সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, তা তাঁরা নিঃশেষে দান করেছেন বিশ্বজনকে। তাই তাঁদের একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন—তাঁদের রচনা তাঁদের মনের ক্রমবিকাশের প্রতিবিম্ব। তাই তাঁদের রচনায় অনেক স্ববিরোধিতা আছে—জীবনের এক পর্যায়ে তাঁরা যাকে সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করেছেন, জীবনের অন্য পর্যায়ে অভিজ্ঞতার ব্যাপকতর পটভূমিকায়, তাঁরা তাকে অসত্য বলে ত্যাগ করেছেন।

তা ছাড়া দুজনের পার্থক্য অনেক সময় বিভ্রমের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিক্ষিতসমাজের ভাষা। এ ভাষায় আমরা চিন্তা করতে অনেকটা অভ্যস্ত। গান্ধীজীর ভাষা জনসাধারণের ভাষা; কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিতদের পক্ষে এ ভাষা সময় সময় দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

তবে শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মতামতের আলোচনা করার একটা সুবিধা আছে। এঁদের শিক্ষাসম্পর্কিত ধারণাগুলি খুবই সুস্পষ্ট এবং প্রায় একই কথা এঁরা দীর্ঘকাল ধরে বলে গেছেন। তাই পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি: "যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেন না, আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসিনি।"* আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা তাঁকে প্রথমাবধি ব্যথিত করেছিল। আমরা ব্যস্ত ছিলাম সন্তর্পণে পরের

* শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৫

অনুকরণ করায়। বিদেশের বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধানের মোটা মোটা পুঁথির সঙ্গে সযত্নে মিলিয়ে আমরা অতি সাবধানে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গড়ে তুলছিলাম। কোথাও একটু অমিল ঘটলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠা, ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পড়া ছিল আমাদের স্বভাব। আমাদের যে কিছু বলার আছে, কিছু দান করার আছে, নিজেদের মত করে গড়ার প্রয়োজন আছে, সে কথা আমরা ভুলেছিলাম। আমাদেরও যে কিছু বক্তব্য আছে, করণীয় আছে, সে দিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। আমরা তাঁকে কবি বলে দূরে রেখেছি, কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর কথাকে আমল দিইনি। তাই এই ব্যথার কথাই তাঁকে বারবার বলতে শুনি।

গান্ধীজীও কর্মের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষার কথা প্রচার করে গেছেন, তার ধারণা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করলেও, তাঁর এ বিষয়ে অভিমত মূলতঃ এক ছিল। আফ্রিকাতে টলষ্টয় ফার্মের সৃষ্টি করতে গিয়ে শিক্ষার যে ছবি তাঁর মর্মে এসেছিল পরবর্তী কালে নয়ী-তালিমের পরিকল্পনাতেও আমরা সেই রূপটিই দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মূলমন্ত্র হচ্ছে ঐক্যবোধের মন্ত্র। এই ঐক্যের বোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে শিক্ষা। "ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ। না-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ, মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে, তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ।

সে যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”* বস্তুর বিভিন্নতার পিছনে, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের মধ্যে, চিন্তার বহুমুখী প্রকাশের মধ্যে মানুষ যখন ঐক্যের সূত্র খুঁজে পেতে আরম্ভ করে, তখনই তার শিক্ষার সুরু হয়, তার জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম গড়ে উঠতে সুরু করে।

পশ্চাত্যের লোকেরা বস্তুজগতে এই ঐক্যের সন্ধান লাভে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই ঐক্যের সন্ধান করতে করতেই জড়বিজ্ঞান আজ অ্যাটম, ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি আবিষ্কার করেছে, পরমাণুর রহস্য আবিষ্কার করে বস্তুর বৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্যের বোধকে আয়ত্ত করেছে। তাই বস্তুজগৎ আজ বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে পাশ্চাত্যের গলায়, বস্তুর বাধাকে তাই ওরা অতিক্রম করতে পেরেছে, তার বিরূপ স্রোতকে তারা কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে। এই জয়কে গালাগালি করলেই তা মিথ্যা হয়ে যাবে না, কারণ, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা ঐক্যবোধের সত্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে সাদরে বরণ করে না নিয়ে ব্যঙ্গ করলে শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষা পাশ্চাত্যকে প্রবল করেছে, কিন্তু শান্তি দিতে পারেনি। তাই সেখানে দেখি সংঘাত। তাতে শক্তির পরিচয় হয়তো আছে, কিন্তু শিক্ষার পরিচয় নাই। ব্যক্তি হক, জাতি হক, সে যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে, তখনই জগৎকে পর বলে ভাবার দুর্বুদ্ধি জাগে। এই ভেদবুদ্ধি দৃষ্টিকে

* তপোবন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৯

আচ্ছন্ন করে, সত্যোপলব্ধিকে বাধা দেয়। সত্যকে জানবার জন্য গণ্ডীর প্রয়োজন আছে; কারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সত্যকে জানা সম্ভব। তাই বলে ব্যক্তি বা জাতিই প্রধান নয়, সাধনার আসন মাত্র, সাধনার ধন নয়। "এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন, শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেন না অদ্বৈতই শিব।"* তপস্যার জন্য যোগ্য আসনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আসনকে ইষ্টদেবতার স্থানে বসিয়ে পূজা দিতে গেলে ঠকতে হয়। ভক্তি বা জাতির গণ্ডীটাকে বড় করে তুলে, সত্যের বদলে কেবল শক্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে আমরা মঙ্গলকে হারাই, ঐক্যবোধকে হারাই, ফলে শিক্ষার সাধনা ব্যর্থ হয়।

বিশ্বের বাইরের দিকটা বস্তু দিয়ে গড়া। বস্তুজগতের পিছনকার নিয়মের সূত্রকে আবিষ্কার করে পাশ্চাত্য সত্যের এই দিকটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এই সত্যোপলব্ধি পাশ্চাত্যকে শক্তি দিয়েছে। কিন্তু এই শক্তির গর্বে অন্ধ হয়ে পাশ্চাত্য যেই মনোজগতের ঐক্যকে অবজ্ঞা করছে, অমনি তার পরাজয় ঘটছে। "ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।"‡ শিক্ষাসাধনাকে সার্থক করতে হলে শিব ও শক্তির মধ্যে মিলন ঘটাতে হবে, মঙ্গল ও ঐশ্বর্যকে ঐক্যসূত্রে বাঁধবার কৌশলকে আয়ত্ত করতে হবে।

---

* শিক্ষার মিলন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২১

‡ তপোবন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৯

গান্ধীজীও এই ঐক্যের বোধকে শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সত্যই ভগবান এবং এই সত্যকে জানাই শিক্ষা। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার মধ্য দিয়ে সত্যকে লাভ করতে হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকেই শিক্ষা-প্রচেষ্টা বলা চলতে পারে। সত্য কখনও পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায় না, শুধু সত্য পথে প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়া চলে। শিক্ষাপ্রচেষ্টাও তাই অন্তহীন প্রচেষ্টা —মাতৃগর্ভে শিশু যেদিন জন্ম নেয় সেদিন তার সুরু, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত তার অন্ত নেই। নয়ী-তালিমের পরিকল্পনায় গান্ধীজী তাই জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা বলেছেন।

গান্ধীজীর মতে বস্তুজগতেই হক আর মনোজগতেই হক, সত্যের উপলব্ধি আসে কর্মের মধ্য দিয়ে। * জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগই প্রকৃত যোগ, এই যোগের মধ্য দিয়েই মাত্র ঐক্যোপলব্ধি, সত্যোপলব্ধি আসতে পারে। ভালবাসার মধ্য দিয়েই জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সম্ভব। তাই ভালবাসা বা অহিংসাকেই গান্ধীজী সত্যসাধনার উপায় বলেছেন। ‡ আজকাল আমরা

* An academic grasp without practice behind it is like an embalmed corpse, perhaps lovely to look at but nothing to inspire or ennoble.—Young India, 1-9-21.

‡ Truth is a word which literally means that which exists—Sat. For these and several other reasons that I can give you I have come to the conclusion that the definition—Truth is God—gives me greatest satisfaction. And when you want to find Truth as God the only inevitable means is Love, *i. e*, nonviolence, and since I believe that ultimately means and end are convertible terms, I should not hesitate to say that God is Love.—Young India, 31-12-31.

কথায় কথায় চাষীকে প্রণাম জানাই, মজহুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। অথচ অন্যের সঙ্গে জীবনের যোগ নেই আমাদের, কাজকে আমরা অবজ্ঞা করি। সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে বসে ইন্দ্রিয়ের বা বুদ্ধির 'সঙ্কীর্ণ বাতায়ন'-পথে আমরা অন্যকে দেখি, 'জীবনযাত্রার বেড়াগুলি ডিঙ্গিয়ে' অন্যের সঙ্গে মিশে যেতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ একে 'সৌখীন মজহুরী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে যে যোগ দেখা যায়, তা কৃত্রিম। সত্যযোগ থাকে না বলে এর ফলে সত্যের সাধনা ব্যর্থ হয়, হিংসা-বিদ্বেষ-বিরোধে সমাজ কলুষিত হয়ে ওঠে।

গান্ধীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই চরিত্রগঠন। বস্তুজগতের ঐক্যই হক আর মনোজগতের ঐক্যই হক, তাকে উপলব্ধি করতে হলে পুঁথি পড়ে জ্ঞানলাভ করা যথেষ্ট নয়। পুঁথি আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান দিতে পারে মাত্র। উপলব্ধির জন্য জীবনকে যোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে, বিশ্বজগতের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানতে হবে। এজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী পুঁথিকে গৌণ স্থান দিয়েছেন। গান্ধীজীর জীবনে আমরা তাই দেখি, তিনি পুঁথি পড়েছেন কম, চিন্তা করেছেন বেশী; দেশকে জানার জন্য তিনি ভূগোলের ইতিহাসের বই মুখস্থ করতে বসেননি, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার জন্য হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত আর গুজরাট থেকে আসাম পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন; দেশের দারিদ্র্য, দেশের ছুঃখ-বেদনাকে তন্ন তন্ন করে জানার জন্য তিনি মোটা মোটা পুঁথি নিয়ে আরামকেদারায় বসে নেই, তিনি দেশের জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখাপড়াকে রবীন্দ্রনাথও গৌণ স্থান দিয়েছেন। লেখাপড়ার প্রয়োজনকে রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজী কেউই উপেক্ষা করেননি, কিন্তু লেখাপড়াকে শিক্ষার সঙ্গে সমার্থবোধক করে যে আমরা ভুল করছি সে দিকে উভয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, "আজ হইতে ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ—হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভাল করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ—হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়া দেখি—পরের বচন দিয়া না দেখি।"* গান্ধীজীও এইরকম জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে এবং দ্রুত বুদ্ধিকে বিকশিত করা সম্ভব।†

শিক্ষালাভের জন্য যোগ্য পরিবেশের প্রয়োজন। কেবলমাত্র বীজ আর জমি তৈরী থাকলেই হয় না, উপযুক্ত ঋতু চাই, বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য চাই। যেখানে মনোযোগ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা, যেখানে নানা আকর্ষণ প্রলোভন সে স্থান শিক্ষাসাধনার যোগ্য স্থান নয়। তপোবনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল দেখতে পাই। খোলা আকাশ, খোলা বাতাসের মধ্যে, কোলাহল আর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে দূরে, প্রকৃতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গুরুগৃহ থাকবে। সেই গুরুগৃহে স্নেহ ও জ্ঞানলাভের জীবন্ত পরিবেশের মধ্যে শিশু

---

* জাতীয় বিদ্যালয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৬

†". . . an intelligent use of the bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intellect —Harijan, 8-5-37.

শিক্ষাচর্চা করবে—এই ছিল তাঁর কল্পনা। সেই আদর্শেই তিনি শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির লীলাভূমির মধ্যে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছিলেন। "বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিও না।" * রবীন্দ্রনাথের মতে "বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরী হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।" † তাই তিনি তাদের শিক্ষালাভের জন্য বোর্ডিংস্কুলে নয়, গুরুগৃহে পাঠাতে চেয়েছেন। ঘর যদি তেমন ঘর হয়, অর্থাৎ ঘরের পরিবেশ যদি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ হয়, তবে অবশ্য তিনি ঘরে থেকে শিশুর শিক্ষালাভকে সমর্থন করেছেন। তবে তাঁর মতে, শিশুদের যেটা বিকাশের কাল সে সময়টা তাদের গৃহ থেকে দূরে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা সজীব পরিবেশের মধ্যে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষালাভের জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন, এ সম্পর্কে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত। কিন্তু এই পরিবেশের জন্য গৃহ থেকে দূরে আশ্রম গড়ার অপরিহার্যতাকে গান্ধীজী স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, গৃহের পাশেই শিক্ষার পরিবেশকে গড়ে তুলতে হবে, গৃহ এবং সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে শিক্ষা বাস্তব ও সার্থক হয়ে উঠবে। তাঁর মতে, আশ্রম গড়ে সমগ্র দেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব

* শিক্ষা-সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৬
† শিক্ষা-সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৬

নয়। সমগ্র দেশের সকল শিশুকে শিক্ষার জন্য আশ্রমে পাঠালে আশ্রমই নগর হয়ে উঠবে, তার মধ্যে এবং চারপাশে কৃত্রিম পরিবেশ গড়ে উঠবে। এই কৃত্রিমতার মধ্যে শিক্ষা বাস্তবিকতাবর্জিত হতে বাধ্য এবং বাস্তবিকতাবর্জিত শিক্ষা হৃদয়-মনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে ফেলে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে যে যোগ হয়, তা শুধু কথার যোগ, কর্মের যোগ, বোধের যোগ নয়।

গৃহের বর্তমান পরিবেশ যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নয়, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই পরিবেশকে এড়িয়ে গেলে, গান্ধীজীর মতে, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। যে গৃহে আমরা বাস করি, সে গৃহের উন্নততর চিত্র বর্তমানে আমাদের পাঠ্যপুঁথিতে নেই সত্য ; কিন্তু তেমন চিত্র থাকলেই যে আমরা গৃহকে সুন্দর করে তুলতাম তার কোন নিশ্চয়তা নাই। গৃহের পাশে যে শিক্ষালয় থাকবে গৃহ-পরিবেশকে সুন্দর করে তোলা হবে তার শিক্ষাপ্রচেষ্টারই অঙ্গ। শেখা আর করার মধ্যে এর ফলে কোন বিরোধের প্রাচীর থাকবে না। অভিভাবকদের ছাঁচে শিশুকালে গড়ে ওঠা সব সময় অবাঞ্ছনীয় নয়। তবে অজ্ঞাতসারে একটা ছাঁচে গড়ে ওঠা সজীব মানুষের পক্ষে সব সময়ই অবাঞ্ছনীয়। সমাজের সঙ্গে সংযোগহীন-ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ বা শকুন্তলার মত যারা গড়ে উঠবে তারা উত্তরকালে নিজের অজ্ঞাতসারে অন্যের ছাঁচে গড়ে ওঠা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এজন্য সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে গৃহের পাশে বিদ্যালয় গড়ে তোলাকেই গান্ধীজী সমর্থন করেছেন। আদর্শ সম্পর্কে ছাত্রকে সচেতন করে দেবার দায়িত্ব শিক্ষকের। এই আদর্শকে সামনে রেখে প্রাত্যহিক প্রচেষ্টার মধ্য

দিয়ে ছাত্র নিজকে গড়ে তুলবে। এর ফলে শিশুর মধ্যে সমাজের প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করার এবং অনুকূল স্রোতের সহায়তা নেবার শক্তি প্রথমাবধি সঞ্চারিত হবে।

প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণই শিক্ষার যোগ্য স্থান। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে প্রকৃতির শ্যাম-সমারোহের অপ্রতুলতা নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সহরের এবং ধনীদের কথাই প্রধানতঃ চিন্তা করেছেন বলে মনে হয়; কারণ, সহরেই প্রাসাদের চূড়া, কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদিতে প্রকৃতির রূপকে খণ্ডিত এবং বিকৃত করা হয়েছে, ধনীরাই প্রকৃতির কোল ছেড়ে প্রধানতঃ প্রাসাদের বিবরকে বেছে নিয়েছেন। সমগ্র দেশে কিন্তু সহর আর ধনীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। গ্রামাঞ্চলে—যেখানে আজও কোটি কোটি লোক বাস করছে সেখানে—প্রকৃতির অকৃপণ দানের কোন অভাব নেই। মানুষ তার অশিক্ষার ফলে সেখানে যেটুকু বিকৃতি এনেছে, তা সহজেই দূর করা চলে। গান্ধীজীর মতে, প্রত্যেক গ্রামে প্রকৃতির কোলে শিক্ষার আসন পাততে হবে।

গান্ধীজী কিন্তু খেলা কথাটার বদলে কাজ কথাটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন। নিজেকে পরিবেশকে এবং সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকেই শিক্ষালয়ে প্রথমাবধি অভ্যাস করতে হবে। খেলার সঙ্গে কাজের কোন স্ববিরোধিতা নেই, কারণ খেলাও একটা কাজ। খেলা কথাটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহংভাব আছে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার উপর এখানে বড় বেশী জোর দেওয়া হয়। কাজ এই অহংভাবকে দূর করে, বিনম্র করে, পাঁচজনের সঙ্গে একাত্মবোধের শিক্ষা দেয়। শুধু খেলা কথাটার মধ্যে কোন সমাজবোধ নেই, কাজ কথাটার মধ্যে এই সমাজ-সচেতনতা আছে। সহকারিতার এই লক্ষ্য

বিস্তারের সুযোগ না থাকলে বিদ্যালয়ের অবস্থান যাই হক না কেন, তাতে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না।

ছাত্র আর শিক্ষকের সংজ্ঞা ও সম্পর্ক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ধারণার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ দেখতে পাই। দুজনেই মনে করেন, চরিত্রগঠনই শিক্ষার লক্ষ্য। বক্তৃতা দিয়ে চরিত্র গঠন করা যায় না, নিজের জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে ছাত্রের সামনে তুলে ধরে ছাত্রকে উদ্বোধিত করতে হয় ;* স্নেহ দ্বারা ছাত্রের হৃদয়কে অভিষিক্ত করতে হয়, তা হলেই তাতে শিক্ষার বীজ বপন করা চলে। "সবশেষে বলা যেটুকু সবচেয়ে বড় মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক।"† শিক্ষা এই খুশির দান, ভালবাসার দান। "একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ সখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে-ফলে জাগে সেই ভালবাসারই প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালির সম্পর্কে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।" ঁ

---

* "One word only as to the education of the heart. I do not believe, that this can be imparted through books. It can only be done through the living touch of the teacher.—Young India, 1-9-21.

† আশ্রমের শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৬

ঁ আশ্রমের শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৬

তাই শিক্ষাদানের জন্য চাই এমন শিক্ষক যিনি আদর্শকে অন্তরের টানে জীবনে গ্রহণ করেছেন। যিনি নিজের কাজকে খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেননি, তাঁর চিত্ত স্থির থাকতে পারে না। শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে শুধু সামীপ্য থাকলেই চলবে না, তাদের মধ্যে সাযুজ্য ও সাদৃশ্যও থাকা চাই। এ ছাড়া ছাত্রের মনকে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না শিক্ষক। গান্ধীজীর মতে, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠতে পারে শুধু সহকারিতার মধ্য দিয়ে। ছাত্র-শিক্ষক একত্রে মিলে সৃষ্টি করবেন, এমন জিনিস সৃষ্টি করবেন যা তাঁদের নিজকে, পরিবেশকে সুন্দর করে তুলবে। এর মধ্য দিয়ে গভীর যোগের সৃষ্টি হবে শুধু তাঁদের নিজেদের মধ্যে নয়, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে, সমগ্র সমাজের সঙ্গে। তাই গান্ধীজী শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিল্পকাজের কথা বলেছেন। *

আজকাল শিক্ষালয় একটা ছাপ দেবার কারখানা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষক সেই কারখানার একটা অংশ। ঘণ্টা বাজিয়ে কারখানা খোলে, কথার কল কতকগুলি জীর্ণ-অজীর্ণ বুলি আউড়ে যায়। যেমন করে হক, নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পাশের ছাপ যদি শিক্ষক ছাত্রের কপালে এঁটে দিতে পারেন, তবেই তাঁর কর্তব্য শেষ হল। ছাত্রের জীবনকে গড়ে তোলার কোন দায়িত্ব নেই শিক্ষকের,

* By education I mean an all-round drawing out of the best in child and man in body, mind and spirit. I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training".—Harijan. 31-7-37.

সুতরাং জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগও এখানে অবান্তর। কল কাজ করে, দান করে না, খুশির প্রশ্ন তাই ওঠেই না এখানে। গুরু তাই আজ ডাক দিয়ে বলেন না,

যথাপঃ প্রবতা যান্তি, যথামাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো মত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা।

গুরু হবার যোগ্য জ্ঞানী-গুণী লোক আমাদের দেশে নেই তা বললে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানকে ধরে রাখবার কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্র আজ গুরুর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য আসে না, আসে প্রতিষ্ঠানের কাছে পরীক্ষা পাশের ছাপটি আদায় করবার জন্য। যেখানে আজ যত সহজে পরীক্ষার সুযোগ সেখানেই আজ তত ভিড়। শিক্ষার জন্য যে তপস্যার প্রয়োজন আছে, সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এত অবিনয়, এত অশান্তি-বিক্ষোভ। শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের আদর্শকে আমরা ত্যাগ করেছি, শিক্ষা আজ চাকরির সোপান মাত্র, তাই সেখানে সামনের সারিতে স্থান করে নেবার জন্য নির্লজ্জ ঠেলাঠেলির অন্ত নেই।

রাষ্ট্র আজ শিক্ষার ব্যবস্থার ভার নিয়েছে। শিক্ষার ছক বেঁধে দিচ্ছে রাষ্ট্র, শিক্ষকের কাজ সেই ছক অনুসারে ছাত্রদের কাছে শিক্ষার সালসা বিক্রি করা। এ কাজ বেতনভুক ভৃত্যের। গুরুকে আজ আমরা ভৃত্যের আসনে বসাতে চেয়েছি, তাই গুরুর কণ্ঠ আজ নীরব।

"এবারে বাঙলাদেশের বিদ্যালয়গুলির পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমগ্র দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই।"* শিক্ষক জীবিকার জন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁর দায়িত্ব পয়সার ওজনে বিদ্যাবিক্রয় করা নয়; তিনি নিজের সমস্ত জ্ঞানকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে কর্তব্যকে মহিমান্বিত করবেন, এই তাঁর যোগ্য। এ দান অন্তরের টানেই সম্ভব, বাইরের চাপে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চাপটা নিতান্তই বাইরের চাপ। গান্ধীজী তাই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্বাধীন শিক্ষার উপযোগী বলে স্বীকার করেননি।† তাঁর মতে, শিক্ষাকে বাইরের এই চাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। টলষ্টয়ের মত গান্ধীজীও বিশ্বাস করতেন যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার উপর। দেশজোড়া বিদ্যালয় খুললে আর আক্ষরিক শিক্ষার প্রবর্তন করলেই অজ্ঞতা দূর হয় না। একটা অনুন্নত নিরক্ষর দেশের লোক যতটা অসহায়, বর্তমান অতি-জটিল সমাজ- ও রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থাযুক্ত দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা তার চাইতে কম অসহায় ও পরনির্ভরশীল নয়। শিক্ষা যত বাড়ছে, উন্নততর জীবনযাত্রার

---

* শিক্ষা-সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৬

† "Our experiment to be thorough has to be at least somewhere made without alloy and without outside interference. —Hindusthani Talimi Sangh.

মানের নামে অসহায় পরনির্ভরশীলতাকে আমরা ততই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে শিখছি, একেই সহযোগিতা বলে প্রচার করছি। অসহায় পরনির্ভরশীলতা দাসত্বেরই নামান্তর। আমরা বাক্যচ্ছটার আড়ালে এই কুৎসিত সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করছি। এই অসহায় পরনির্ভরশীলতা আমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই একমত। এজন্য শিশুকাল থেকেই বিদ্যালয়ে দেহমনের যথাযথ ব্যবহারের দিকে এঁরা উভয়েই জোর দিয়েছেন। "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্ম-শক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যাতে আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

"আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্ব চর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক, আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আবদার বেড়ে ওঠে—এমন কি ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে…" *

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমালে চলবে না। ছাত্রেরা

* আশ্রমের শিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৬

শ্রম দিয়ে গুরুর দক্ষিণা জোগাবে, রাষ্ট্রের করুণা কবে বর্ষিত হবে তার জন্য অপেক্ষা করে শিক্ষাকে ব্যাহত করলে চলবে না। * পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজী কেউই সমর্থন্ করেননি। এটা ক্ষাত্র যুগ। রাষ্ট্র আজ শিক্ষার উপরেও তার অধিকার বিস্তার করতে চাইছে। এই ক্ষাত্রপ্রভাব মঙ্গলজনক হবে না—উভয়েরই তাই ধারণা। ব্রাহ্মণকে আজ তাঁর সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, ঐশ্বর্য দিয়ে তাঁকে মণ্ডিত করে নয়, তাঁর তপঃশক্তিকে উদ্বোধিত করে।

শিক্ষার মাধ্যম ও উপকরণ সম্পর্কেও গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং এখানেও উভয়ের চিন্তাধারায় আশ্চর্য রকমের মিল চোখে পড়ে।

দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহারের কথা বলে এসেছেন। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে উচ্চতর ভাব প্রকাশ করা যায় না, তা তিনি মুহূর্তের জন্যও স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, "এদেশে অনেককাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাচীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।"† বিদেশী ভাষাকে তিনি বাদ দেবার কথা কখনও বলেননি ; কিন্তু মাতৃভাষাকে আত্মস্থ করার আগে

* "I am very keen on finding the expenses of a teacher through the product of the manual work of his pupils, because I am convinced that there is no other way to carry education to crores of our children. We cannot wait until we have the necessary revenue.—Harijan, 30-0-37.

† ছাত্র-সম্ভাষণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৭

পরভাষাকে গ্রহণ করলে কোন ভাষাকেই আপন করে নেওয়া যাবে না, এই ছিল তাঁর মত। শুধুমাত্র অসময়ে ভাষা শিখতে গিয়ে জ্ঞান ও ক্ষমতার কত বড় অপচয় ঘটছিল, তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিজাতীয় ভাষায় অপরিচিত ভাবগুলিকে আয়ত্ত করার চেষ্টায় ছাত্রেরা শুধু দেহে-মনে বিশীর্ণ হয়ে উঠেছে, ভাষাকে বাহন না করে কুব্জদেহে সেই বিরাট বোঝাকে বহন করে চলেছে এটা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, "আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজী-বাঙলা দুটো বড় রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হলেই কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না।" *

গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবটিও একই। মাতৃভাষাই শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষাদানের একমাত্র মাধ্যম হওয়া চাই, এটা তাঁর দৃঢ় অভিমত। তাঁর মতে, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব। † বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপারে গান্ধীজীর মত অত্যন্ত দৃঢ় ও তীব্র। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এক পাও এগোয় না, এই তাঁর অভিমত। এজন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরীর অছিলায় বা মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের যোগ্য করে নেবার অজুহাতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমকে তিনি একদিনের জন্যও জীয়িয়ে রাখতে রাজী নন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কাজ সুরু হলে পাঠ্যপুস্তক আপনি তৈরী হবে

* শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৫

† Real education is impossible through a foreign medium.'—Young India, 1-9-21.

এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সাধারণতঃ ছাত্রদের অসুবিধার দোহাই দিয়ে বিদেশী ভাষার ভূতকে আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে জীয়িয়ে রাখা হয়েছে। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে আসলে শিক্ষকদের অজীর্ণ বিদ্যা এবং মাতৃভাষায় প্রকাশের অক্ষমতাই এর প্রধান কারণ। এই অক্ষমতার কারণও এই যে, তাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে। এরকমভাবে শিক্ষালাভ করার ফলে আমাদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, প্রকাশ-ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে, আমরা আপনার গৃহে পরবাসী হয়ে যাচ্ছি।*

বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভের প্রয়োজনকে রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধীজীও উপেক্ষা করেননি। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে ১৫ বৎসর বয়স থেকে প্রয়োজন ও শক্তি অনুসারে বিদেশী ভাষার চর্চা করার সুপারিশ তিনি করেছেন। তবে প্রত্যেকের পক্ষে বিদেশী ভাষা শেখার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করেননি। বিদেশী ভাষা চর্চার আগে প্রত্যেকে রাষ্ট্রভাষা

---

* The foreign medium has caused brainfag, by an undue strain upon the nerves of our children, made them dreamers and imitators, unfitted them for original work and thought, and disabled them for filtrating their learning to their family or the masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land. It is the greatest tragedy of the existing system. . . . If I had the powers of a despot, I would to-day stop the tuition of our boys and girls through a foreign medium . . . I would not wait for the preparation of text books. They will follow the change. —Young India, 1-9-21.

শিখবে, এর উপর তিনি জোর দিয়েছেন। ভারতের জাতীয় সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এর প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন। যাঁদের ভাষা শেখার আগ্রহ এবং ক্ষমতা আছে তাঁরাই বিদেশী ভাষা শিখবেন—সর্বসাধারণের ঘাড়ে জোর করে একটা ভাষা চাপিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, এই তাঁর অভিমত। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু সুন্দর তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে, তাকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু সেজন্য প্রত্যেকের বিদেশী ভাষা শেখার কোন প্রয়োজন নেই, তাতে সময় ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটবে মাত্র। যাঁরা বিদেশী ভাষা শিখবেন তাঁদেরই দায়িত্ব হবে বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে মাতৃভাষায় জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা।

কিন্তু ভাষাই শিক্ষাদানের এবং শিক্ষালাভের একমাত্র মাধ্যম হবে না। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, চরিত্রগঠনই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েরই মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র চিন্তা ও ভাবকে আয়ত্ত করলেই চরিত্র গঠিত হয় না ; কর্মের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনকে গড়ে তোলাই চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। এজন্য শিক্ষার প্রকৃত মাধ্যম হবে ভাষা নয়, জীবন ; সেই পূর্ণ জীবনকে প্রকাশের একটা উপায় মাত্র হবে ভাষা। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখাপড়াটা প্রধান হয়ে আসন জুড়ে বসে থাকবে না, ও হবে জীবন গড়ার একটা অঙ্গ মাত্র। ভাষার ছটা এবং তর্কের ঘটায় যে শিক্ষার প্রকাশ, তাকে রবীন্দ্রনাথ 'পেডন্ট্রি' বলে আখ্যাত করেছেন, প্রকৃত শিক্ষালয়ের আদর্শ এই 'পেডন্ট্রি' অর্জন করা

হতে পারে না। তাঁর মতে শিক্ষালয়ের কাজ হচ্ছে সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং প্রতিষ্ঠাতা হওয়া। "যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করেনি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী; পাশ্চাত্য দেশেও স্থূল পদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডন্ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এদেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত, সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে।" এই সংস্কৃতি-ধারাকেই সার্বজনীন শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠার মাধ্যম ভাষা হতে পারে না, জীবনের মধ্য দিয়েই একে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমাদের বিদ্যালয়কে কর্মশালা করতে হবে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। "আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয় মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হক, এইটেই শিক্ষা-সাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে।"* গান্ধীজী এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে শুধু গ্রহণ করেছেন তা নয়, এ বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের চাইতে অনেক বেশী। তাঁর মতে, পুঁথি পড়ার মধ্য দিয়ে বুদ্ধির ভালভাবে বিকাশ ঘটে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্প কাজ করার মধ্য দিয়েই বুদ্ধির বিকাশ সবচেয়ে ভাল এবং দ্রুত হয় এই

* শিক্ষা ও সংস্কৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৩৫

তাঁর অভিমত।* এজন্য গান্ধীজী প্রথমাবধি সমস্ত শিক্ষা শিল্প-কাজের মাধ্যমে পরিবেশন করার প্রস্তাব করেছেন। শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়েও এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এই তাঁর মত। তাঁর এই মতের সঙ্গে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। শিল্প-কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার যত অগ্রগতি হবে শিক্ষার্থীর শিল্পনিপুণতা, শিল্প দিয়ে সমাজকে সেবা করার যোগ্যতা, শিল্পদ্রব্যের আর্থিক মূল্য বেড়েই চলবে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর সামাজিক মূল্য এবং আর্থিক স্বাবলম্বন দুটোই বাড়বে। শিক্ষার এই পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে শিক্ষার স্বাধীনতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। স্বাধীনতা আর পরনির্ভরতা দুটি পরস্পর-বিরোধী শব্দ, তারা কখনই একার্থবোধক হতে পারে না।

শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে আজ আমাদের হাহাকার ও অভিযোগের অন্ত নেই। পাশ্চাত্যের নকলে টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চি, শত শত উপকরণ, রাশি রাশি ফাইল দিয়ে আমরা শিক্ষা-বিভাগকে সাজিয়ে ভদ্রগোছের করার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। কিন্তু

---

* The utterly false idea that intelligence can be developed only through book reading should give place to the truth that the quickest development of the mind can be achieved by artisan's work being learnt in a scientific manner.—Harijan. 9-1-37.

. . . an intelligent use of the bodily organs in a child provides the best and quickest way of developing his intelligence.—Harijan, 8-5-37.

নিষ্ঠুর অদৃষ্টের এমনি বেয়াড়া রসিকতা যে, লজ্জারক্ষা কিছুতেই আর করা যাচ্ছে না। বাঁদিপোতার খাটো গামছাকে বেনারসী শাড়ীর মত সাজিয়ে পরার চেষ্টার অন্ত আমাদের নেই, কিন্তু এমনি বেয়াড়া গামছা যে, কিছুতেই তাকে গুছিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না, টেনেটুনে একদিকটা একটু গুছাতেই অন্য দিকটা একেবারে নিরাবরণ হয়ে পড়ছে। চেয়ার-টেবিল কিনে যখন বিদ্যালয়কে দস্তুরমত সাজান গেল, তখন দেখা গেল, ব্ল্যাকবোর্ড চক কিনবার পয়সা নেই, অর্থের অভাবে পুস্তক কেনা যাচ্ছে না। রাশি রাশি টাকা খরচ করে লম্বা বিদেশী লেজুড়ওয়ালা শিক্ষাবিদ্ আনলাম, হাজার হাজার টাকা খরচ করে রাশি রাশি কাগজের উপর সুন্দর পরিকল্পনা রচিত হল, ফাইলে ফাইলে অফিস সুসজ্জিত হল, উঁচু মাইনের চাকুরেদের যথাস্থানে বসালাম—হঠাৎ দেখি, জীর্ণ শিক্ষকরা মাসের পর মাস সামান্য বৃত্তিটুকুও না পেয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের যে প্রয়োজন আছে, তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যাদানের কাজে ব্যস্ত রাখার সুযোগ দেবার প্রয়োজন আছে, পরিকল্পনা রচনার বেলায় সে কথাটা চিন্তা করতেই ভুল হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। পরানুকরণের অন্ধ প্রবৃত্তিই যে এর কারণ, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন। শিক্ষার বেলায় উপকরণটাই বড় কথা নয়, শিক্ষা দেবার যোগ্য লোককে খুঁজে পাওয়াই আসল কথা। আমরা উপকরণকে নিয়েই মেতে উঠেছি, তাই শিক্ষকের কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, যেখানে পৃথিবীর ১/১২ লোক পৃথিবীর ১/২ সম্পদকে ভোগ করেছে, যারা সাম্রাজ্যবাদের জাল বিস্তার করে পরের ধনে

নিজের দেশে বিলাসের উপকরণ স্তূপীকৃত করেছে, তাদের সঙ্গে উপকরণের প্রতিযোগিতায় নামাই শিক্ষার ব্যাপারে বড় কথা নয়। "আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরের কর্মকুশলতা ও অন্তরের আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায়, এইটেই শিক্ষাসাধ্য।"* এই শিক্ষালাভের জন্য যে কেবল বাধ্য হয়ে উপকরণের স্বল্পতাকে স্বীকার করতে হবে তা নয়, উপকরণের স্বল্পতা প্রকৃত শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপম ভাষায় এই প্রয়োজনের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার চাইতে সুস্পষ্ট কিছু এ সম্বন্ধে বলা সম্ভব কি না জানি না। তিনি বলেছেন,

"পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম, কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ, তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন, তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি, তবে আর কিছু না হউক, ইহাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার, মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে বেশী কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুসমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ

* শিক্ষা ও সংস্কৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৫

সভ্যতা ; বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা ; বস্তুতঃ তাহা গলদঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলো জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা।*

রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষমতার কথার উল্লেখ করেছেন, সাধারণ উপকরণে বিচিত্র ও সূক্ষ্ম কাজ করার যে নিপুণতার কথা বলেছেন, সে ক্ষমতা আমাদের দেশের জনসাধারণের এখনও আছে। আমাদের এই বিরাট দেশে আমরা যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছি তাদেরই ঘাড়ে এই অক্ষমতার ভূত চেপেছে, অন্ধ অনুকরণের প্রবৃত্তি এসেছে। এরাই আজ দেশের শাসন-যন্ত্রের কর্ণধার, সুতরাং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরাজয়কে সমগ্র দেশের ঘাড়ে চাপাবার আগ্রহের আজ এদের অন্ত নেই।

এই সাংস্কৃতিক পরাজয় একটা জাতির আত্মহত্যার সামিল। তাই একে আজ বাধা দিতেই হবে। বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির হাত থেকে আত্মরক্ষার শক্তি কিভাবে সঞ্জাত হতে পারে, কিভাবে জনসাধারণ বুদ্ধিমানের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারই উপায় গান্ধীজী আমাদের দেখিয়ে গেছেন তাঁর সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে। গান্ধীজীর মতে শিক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য উপাদানে আমাদের নিজেদের তৈরী করে নিতে হবে। শুধু রাষ্ট্রের কাছে ভিক্ষা করার প্রবৃত্তি থেকে, অক্ষমতার দোহাই দিয়ে পরের কাছে হাত পাতার অভ্যাস থেকে আমাদের মুক্ত

* শিক্ষা সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হতে হবে। এই হবে অন্তরের প্রকৃত উদ্বোধন, অপরের অন্ধ অনুকরণ নয়। শিল্প-শিক্ষা অতীতে আমাদের মহৎ করেনি, বিশ্বের দরবারে তো আমরা সম্মানের আসন লাভ করিনি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। গান্ধীজী এর উত্তর দিয়েছেন এই যে, যখন শিল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন শিক্ষা মানুষকে নিঃসন্দেহে মনুষ্যত্বের দিকে নিয়ে যায়। শিল্প কাজ মানুষকে যখন বিকশিত করেনি, মহত্তর করেনি, তখনই বুঝতে হবে আমরা যন্ত্রবৎ শিল্প শিক্ষা করেছি। *

আর্থিক স্বাবলম্বন এবং বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা সম্পর্কে আমরা এই প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব না। এ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি। † আর্থিক স্বাবলম্বনের প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে ঘোরতর আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সম্পর্কে বাদানুবাদ এখনও শেষ হয়নি। এই বিষয়ে গান্ধীজীর প্রস্তাবকে একটা মৌলিক এবং অবাস্তব প্রস্তাব বলে মনে করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবের বাস্তবিকতা প্রমাণসাপেক্ষ। বস্তুতঃ এ সম্পর্কে পূর্ণ প্রয়োগও আমরা এ পর্যন্ত করিনি, সুতরাং প্রমাণের প্রশ্নই বর্তমানে ওঠে না। কিন্তু এ প্রস্তাব যে মৌলিক নয়, গান্ধীজীই যে

---

* "I want that the whole education should be imparted through some handicraft or industry. It might be objected that in the middle ages only handicrafts were taught to the students: but the occupational training, then, was far from serving art educational purpose. The crafts were taught only for the sake of the crafts, without any attempt to develop the intellect as well".—Harijan. 30-10-37.

† বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন—শিক্ষাব্রতী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭)
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা—শিক্ষাব্রতী (আশ্বিন ১৩৫৭)

সর্বপ্রথমে একটা আজগুবি প্রস্তাব করেননি তা আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি। গান্ধীজী এই প্রস্তাব করেছেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব ১৯২১ সালেই উপস্থাপিত করেছেন। আর্থিক স্বাবলম্বনের প্রশ্নে গান্ধীজী নৈতিক ও দার্শনিক যুক্তি ছাড়া কতকগুলি বাস্তব যুক্তিও দেখিয়েছেন। দেশের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এর কারণ।

সহশিক্ষার প্রশ্নে তাঁদের যুক্তিকে নিয়ে রোমন্থন করা নিষ্প্রয়োজন। উভয়ে তাঁদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে এ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। দুজনেই সহশিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। কেবলমাত্র যুক্তি দিয়ে নয়—এর বাস্তব প্রয়োজনকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের পরীক্ষা থেকেও এই প্রমাণিত হয়েছে যে, সরল অকৃত্রিম পরিবেশে ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বেড়ে ওঠা শিক্ষাকে স্বাভাবিক এবং মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলে।

সমস্ত আলোচনা থেকে এইটেই প্রতীয়মান হবে যে, শিক্ষা বিষয়ক প্রত্যেকটি গুরুতর প্রস্তাবই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে করেছেন। গান্ধীজী তাঁর অনন্যসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে সেই প্রস্তাবেরই অনুসরণ করেছেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য এ থেকে বোঝা যাবে। সম্বোধনটা তাঁর কাছে নিছক একটা সম্বোধনমাত্র ছিল না, সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী অর্থহীন একটা সম্বোধনের জন্য একটা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। গান্ধীজী এই সম্বোধন দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিন্তানায়ক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাণীর ব্যাখ্যায় এবং জীবনে তাঁকে গ্রহণ করায় গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী

বিশ্বসত্যের চিরন্তন বাণী, তাই তিনি যা বলেছেন তাতে সার্বজনীন সত্যের সন্ধান মেলে। কিন্তু তাঁর চিন্তা দেখতে পাই প্রধানতঃ শিক্ষিতসমাজকে কেন্দ্র করে, তাঁর দৃষ্টান্ত দেখি প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে নেওয়া। 'জীবন যাত্রার বেড়াগুলি' ডিঙ্গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে 'ও পাড়ার প্রাঙ্গণে' যেতে পারেননি। বিশ্বজনের সঙ্গে তাঁর যে যোগ তা মনের যোগ, বোধের যোগ নয়। তাই জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, তারি বাণী লাগি আমি কান পেতে আছি।' গান্ধীজীর মধ্যে আমরা মাটির কাছাকাছি সেই মানুষটির সন্ধান পাই। তাই একই সত্যের পূজারী, একই চিন্তাধারার বাহক হওয়া সত্ত্বেও দুজনের জীবনে, দুজনের কাজে, দুজনের ভাষায়, আমরা এত তফাৎ দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছেন, পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন, গান্ধীজী পথ কাটতে সুরু করেছেন। গুরু তাই শিষ্যকে ডাক দিয়ে বলেছেন, তুমি মহাত্মা। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, গঙ্গা-যমুনার এই যুক্ত ধারায় আমাদের দেশ অভিষিক্ত হয়েছে।

আমরা এই পরম সৌভাগ্যকে আমাদের কাজে নিয়োজিত করব কি না, এই ধারাকে বহন করে আমাদের দেশকে শস্য-শ্যামল করে তুলব কি না, সে আমাদের উপর নির্ভর করবে। আমরা এতদিন কেবলমাত্র কথার মালা গেঁথেই এঁদের সম্মানের নামে অসম্মান করেছি। আজ একটা বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করব কিনা, সে আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও ভাবী সমাজ

গান্ধীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে এক সুদূরপ্রসারী নীরব সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত। * তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার ফলে সহর এবং গ্রামের মধ্যে একটি সুস্থ নৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে, বর্তমান সমাজে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বিষাক্ত সম্পর্ক রয়েছে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাঁর মতে, এর ফলে ক্রমক্ষীয়মাণ গ্রাম-গুলি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন এক সমাজের গোড়াপত্তন হবে, 'ভোগস্ফীত' এবং 'সর্বহারা' এই দুই অস্বাভাবিক শ্রেণী যা আজকের সমাজে রয়েছে তার চিহ্নও থাকবে না। এই সমাজে প্রত্যেকে বেঁচে থাকার মত মজুরি পাবার এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার সম্পর্কে

---

* "My plan to impart primary eduction through the medium of village handicrafts like spinning and carding, etc., is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far-reaching consequences. It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes. It will check the progressive decay of our villages and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the 'haves' and 'have nots' and everybody is assured of a living wage and the right to freedom......" *Harijan*, 9-10-37.

নিশ্চিন্ত হতে পারবে। বুনিয়াদী-শিক্ষা পরিকল্পনায় এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গোড়ার কথা। লেখাপড়া শেখাকে গান্ধীজী বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিকল্পনায় কখনও মুখ্য স্থান দেননি। তাঁর মতে শিক্ষিত হবার বহুবিধ উপায়ের মধ্যে লেখাপড়া একটি উপায় মাত্র। শিক্ষিত হওয়া মানে আদর্শ অনুসারে চরিত্রকে গড়ে তোলা। কিন্তু আদর্শকে জানবার জন্য, চরিত্রকে গড়ে তোলার জন্য মহৎ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মানবাত্মার যুগযুগসঞ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করার প্রয়োজন আছে—এখানেই লেখাপড়া শেখার সার্থকতা। এই আহরণ-ক্রিয়া যদি লেখাপড়া না করলেও সম্ভব হয়, তবে শিক্ষিত হবার জন্য লেখাপড়া নিষ্প্রয়োজন—যেমন আমরা দেখতে পাই, সাধুসন্তদের জীবনে। বুনিয়াদী শিক্ষায় মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে কর্মকে, কারণ চরিত্র গঠনের জন্য কর্ম অপরিহার্য। কর্ম আমাদের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্র কিভাবে গড়ে উঠেছে তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মে, আমাদের গড়ে-তোলা নানা রীতিনীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এমন কাজ বেছে নেওয়া হয়েছে যা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পিত সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে আমাদের গড়ে ওঠার পরিপোষক। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কাজগুলি করা হবে—সূতাকাটা, কাপড়বোনা, কৃষি প্রভৃতি শিল্প কাজ, অথবা সাফাই, প্রার্থনা প্রভৃতি অন্যান্য কাজ—তা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কর্মের সমষ্টি-মাত্র নয়—এমন কি, এগুলি সবচেয়ে ভাল লেখাপড়া শেখার মাধ্যম মাত্রও নয়। লেখাপড়া শেখার মাধ্যম হিসাবে এগুলির প্রচুর মূল্য

হয়তো আছে কিন্তু এই কাজগুলির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পিত সমাজবিপ্লবের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা।

কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যেভাবে এই কাজগুলি করা হয় তাতে ঐ কথা মনে করার প্রচুর কারণ থাকে যে, এই কাজগুলির বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্পর্কে আমরা বিন্দুমাত্র অবহিত নই। বিদ্যালয়ে প্রচুর হাতেকাটা সূতা জমে উঠতে থাকে আর ছাত্র-শিক্ষক সকলেই মিলের কাপড় ব্যবহার করেন, এমন দৃষ্টান্তের কোন অসদ্‌ভাব নেই। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে করণীয় কাজগুলির বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে এগুলিকে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীতে স্থান দেবার দুটি কারণ থাকতে পারে :—(১) বুনিয়াদী শিক্ষার বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতা অথবা এই আদর্শে অবিশ্বাস ; (২) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে করণীয় কাজগুলি কিভাবে ঐ সমাজাদর্শকে রূপায়িত করতে পারে, সে সম্পর্কে চিন্তাধারার অভাব। আমরা পর্যায়ক্রমে এই দুটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব।

সমাজবিপ্লব কি ও কেন

বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে গান্ধীজী এক সমাজবিপ্লবের দাবি করেছেন। এখানে এই 'বিপ্লব' কথাটির তাৎপর্য কি? বিপ্লব বলতে আমরা একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ধারণা করে বসে আছি। একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে কিংবা একদলের হাত থেকে অন্যদলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বিপ্লব নয়। তাঁর মতে সমাজের অগ্রগমন বিবর্তন অথবা বিপ্লব দুয়েরই মধ্য দিয়ে হতে পারে। জন্মের পর প্রতিমুহূর্ত আমরা যে এগিয়ে চলি এটাই বিবর্তন,

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসে বিপ্লব। মৃত্যুতে প্রাণের শেষ নয়, নূতন করে চলার আরম্ভ মাত্র।* জন্ম ও জীবনের ক্রমবিকাশের মত মৃত্যুও প্রাণের শাশ্বত যাত্রায় অপরিহার্য। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন প্রতি-মুহূর্তে আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তার সমাধানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়, অবশেষে একদিন এই প্রচেষ্টায় প্রাণকে আহুতি দিয়ে জীবনকে অগ্নিশুদ্ধ করে নিতে হয়, সুরু করতে হয় নূতন প্রচেষ্টা, তেমনি সমাজ-জীবনেও বিবিধ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিবিধ সামাজিক বিধি-বিধান, অনুষ্ঠান-সংগঠন নিয়ে। যত দিন যেতে থাকে ততই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে এগুলির যাচাই হতে থাকে, এদের ক্রমপরিবর্তন সংসাধিত হয়। এমনি করে ঘটে সমাজের বিবর্তন। অবশেষে এমন একটা সময় আসে যখন বর্তমান বিধি-ব্যবস্থা, সংগঠন-সংস্থা দিয়ে আর সমস্যার সমাধান করা চলে না। তখন লগ্ন আসে বিপ্লবের, বহু দিনের ক্রমপ্রস্তুতিতে পরিবর্তনের যে আবহাওয়া তৈরী হয়ে থাকে তাতে অকস্মাৎ বিপ্লবের ঝড় এসে লাগে—রূপান্তর ঘটে সমাজের। সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজের এই নূতন সংগঠনকেই গান্ধীজী বলেছেন সমাজ-বিপ্লব।

সুতরাং,প্রশ্ন আসে সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হল কেন? আমাদের বর্তমান সামাজিক সংগঠন কি আর আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারল না?

---

*"The nations heve progressed both by evolution and revolution. The one is as necessary as the other. Death which is an eternal verity is revolution as birth and after is slow and steady evolution..." *Young India*, 2-2-22.

মূল সমস্যা

মানুষের ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব, ইতিহাসের সূচনা থেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে আত্মবিকাশের জন্য। মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছে প্রয়োজনের খাতিরে—শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য; আবার মানুষ পরস্পরের কাছে এসেছে ভালবাসার টানে। দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। এই ঐক্যবোধের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ। মানুষ তাই চেয়েছে পারস্পরিক বিরোধকে দূর করতে। এই প্রচেষ্টায় যতটুকু সাফল্যলাভ করে গেছে, মানুষ ততখানি শক্তিমান হয়েছে। পশুর মত নিরাবরণ নিরাভরণ ছিল যে মানুষ, সে সৃষ্টি করেছে অজস্র সম্পদ। কিন্তু বর্তমান সমাজ-সংগঠন, বর্তমান ভোগলিপ্সা নিয়ে মানুষ যত এগিয়েছে ততই বিরোধকে দূর করার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সভ্যতা জড়িয়ে পড়েছে বিরোধের বেড়াজালে। যে ভোগলিপ্সা মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে, সে আজ বিষমুখটি আমাদের দিকে ফিরিয়ে ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়েছে, তাই বিরোধকে দূর করার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধতা তা আজ যূথবদ্ধ পশুর গর্জনে পরিণত হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি মানুষকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়েছে। যুদ্ধকে শেষ করার জন্য মানুষ বহু যুদ্ধ করেছে কিন্তু ক্রমেই বৃহত্তর যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আজকে। ভোগ এনেছে অতৃপ্তি, মত্ততা; তাই যে বিজ্ঞানচর্চা আমাদের শক্তি দিয়েছে, তা আমাদের কাছ থেকে মঙ্গলকে আবৃত করে রেখেছে, 'সত্যম্ শিবম্ অদ্বৈত্যম্' রূপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। শক্তিচর্চার পথে সভ্যতা যতটা এগিয়ে যেতে পারে আমরা ততটা এগিয়েছি। আমরা আণবিক শক্তির রহস্য আবিষ্কার করেছি,

আরও হয়তো খানিকটা এগিয়ে চলা চলতে পারে এ পথে ; কিন্তু এ পথে চলার সীমারেখা আমরা আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ বোধ আমাদের এসেছে যে, ঐক্যসাধনার জন্য, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে পথে চলা প্রয়োজন, এ পথ সে পথ নয়। বিশ্বের কণায় কণায় যে একই শক্তির প্রকাশ, এ শিক্ষা বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে, কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধের অনুভূতি বিজ্ঞান আমাদের দিতে পারেনি, দিতে পারে না। এ বোধের জন্য বর্তমান জীবনযাত্রা, বর্তমান সংগঠন পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্যই বর্তমান পথে অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী বিরোধের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠা সম্ভব হয়েছে। সকল শিক্ষাকে ছাপিয়ে ভোগের মত্ততা আমাদের অন্তরকে পরাভূত করছে, তাই ধনীতে দরিদ্রে আজ এত বড় পার্থক্য, তাই আজ মুষ্টিমেয়ের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত আর কোটি কোটি মানবাত্মা নিপীড়িত, অসহায়। এইজন্যই গান্ধীজী সমাজ-বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন।*

---

*"A certain degree of physical harmony any comfort is necessary, but above that level, it becomes a hindrance instead of help. Therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a point a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptaousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they may not hinder him in his service of humanity, in which all his energies should be concentrated." —*Harijan*, 29-8-36.

১৩২৮ সনের ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার উদ্বোধন করতে গিয়ে সভাপতি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেন : "আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে—সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল, তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড় যুদ্ধ চলে আসছে, গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে!" এই শান্তিই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। আত্মবিকাশের অন্তর্নিহিত অমোঘ নিয়মে মানুষ বিরোধ দূর করার জন্য সমাজ-সংগঠনের সাধনা করছে, প্রতিদিন বিশ্ব হয়ে উঠছে ক্ষুদ্রতর, দূর-দূরান্তরের মানুষ নিকট-তর হচ্ছে। অথচ কোথাও রয়েছে সংগঠনে ত্রুটি যার ফলে মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে ছাপিয়ে তার ভিতরকার দানবটাই বার বার বড় হয়ে উঠছে। তাই বিশ্বব্যাপী বইছে এক অশান্ত হাওয়া, বিপ্লবের অগ্নি-শিশুর পদশব্দের আভাস, বর্তমান সংগঠনকে ভেঙে নূতন করে গড়ার আহ্বান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা চলছে, তার বিশ্লেষণ করে গান্ধীজীর বিপ্লব-প্রচেষ্টার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করব।

ইউরোপের সমাধান প্রচেষ্টা

জনবহুল ইউরোপে বিরোধের নগ্ন রূপটা নিরাবরণ হয়ে পড়ল বড়

তাড়াতাড়ি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন—সবাই ভোগের পূর্ণ-পাত্রটা নিজের মুখে তুলে ধরতে চায়। তাই দলবদ্ধ হিংস্র জীবের মত বিভিন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠী একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বার বার। তাই এদের ইতিহাসে দেখি, যুদ্ধের আর শেষ নেই, সন্ধির দলিল স্বাক্ষরিত হতে না হতেই অন্য দিকে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। বিরোধের প্রতিকারের চেষ্টা না করে চলল একে চাপা দেবার চেষ্টা। তাই "ইউরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পলিটিকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্‌-এর ভিতর দিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপল্‌ অ্যালায়েন্স হয়েও হল না। বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ-কন্‌ফারেন্স হল না, শেষে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments"।* আমরা জানি, লীগ অব নেশন্‌স্‌ও টেঁকেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তার পর আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অক্ষমতার কথা আমরা চতুর্দিকে শুনতে পাচ্ছি এবং পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অস্ত্রসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ এতে ঐক্যসাধনার স্থান নেই, আছে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাও এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিজেকে মহত্তর করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা নয়, অন্যকে শোষণ করে স্ফীত হবার চেষ্টা।

* আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতির ভাষণ।

জাতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাবার যে ভ্রান্ত চেষ্টা ইউরোপ একদিন করেছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধের তীব্রতা তারই অপরিহার্য বিষময় ফল। ভোগের লোভে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রাচীর গড়ে উঠেছিল ভোগস্ফীত আর সর্বহারাদের মধ্যে। ফরাসী বিদ্রোহ হল, ইংলণ্ডে প্রজাবিদ্রোহ হল, ধর্মগুরু পোপের বিরুদ্ধে, যাজকদের পাপাচরণের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত হল; কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। অজ্ঞ জনসাধারণ শক্তির রশ্মিকে সংযত করে রাখতে পারল না। আবার মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর হাতে ফিরে গেল ক্ষমতার রশ্মি, আবার অন্তর্বিরোধের শিখা ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। ইউরোপের ভাগ্যে সেই সময়েই এল শিল্পের নবযুগ। জাতীয় সর্বহারাদের সেই সুযোগে ছড়িয়ে দেওয়া হল দেশ-দেশান্তরে। দেশ-দেশান্তর থেকে লুটে আনা সম্পদ দিয়ে কয়েকটি জাতিকে একটা কৃত্রিম চাক্‌চিক্যে উজ্জ্বল করে তোলা হল। তার ফলে উৎখাত হল বহু প্রাচীন সভ্যতা। আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান্‌স্‌, আফ্রিকায় নিগ্রোরা, এশিয়ায় ভারতীয় ও চীনারা, আরও অনেকে ইউরোপের ভোগলালসার আগুনে ইন্ধন হয়ে রইল। তারই ফল আজকাল বিশ্ব-ব্যাপী বিরোধের ধূমরাশি। সুতরাং, ইউরোপের শান্তিস্থাপনের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা প্রথমাবধি যে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছে, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রচেষ্টা

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অন্তর্বিরোধ এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের সমাধান খুঁজেছিল ভূমিগত সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে। সাময়িক-

ভাবে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হয়তো হয়েছিল, কিন্তু সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে ব্যাপকতর রূপ নিয়ে—এশিয়া এবং আফ্রিকার বর্তমান ইতিহাস তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিরোধ আজ শুধু ব্যাপকতর হয়নি, তীব্রতর হয়েছে। ইউরোপীয় ভোগের মন্ত্রে দীক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রের সমাধান-প্রচেষ্টা নিয়েছে সামান্য ভিন্নরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার প্রায় ১।২০ অংশ অথচ সম্পদের প্রায় $\frac{1}{2}$ রয়েছে এই যুক্তরাষ্ট্রে। তবু ভোগলিপ্সার অন্ত নেই এখানেও। বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, বিপুল কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক জগতে অপরাজেয় সাম্রাজ্য বিস্তারে মত্ত। পৃথিবীকে নিঃস্ব করে ধনরত্ন এক-একবার বাসা বাঁধছে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে। নিঃস্ব পৃথিবীর সঙ্গে কারবার চলে না ; তাই আবার যুক্তরাষ্ট্র বিলিয়ে দিচ্ছে কিছু কিছু ধন, আবার চলছে খেলা। এতে শুধু জমা হচ্ছে ঈর্ষা, তৈরী হচ্ছে ব্যবধান ; তবু মত্ততার শেষ নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আজ বিরোধ চায় না, যুক্তরাষ্ট্র সজ্ঞানে শান্তিরই প্রচেষ্টা করে চলেছে ; তবু অজ্ঞানে তার এই প্রচেষ্টা বাঁচিয়ে রাখছে বিরোধকে, কারণ বিরোধের ভয়, দুর্বলতা ছাড়া এ খেলা চলতে পারে না। বিভিন্ন জাতির আত্মনির্ভরশীল হয়ে না ওঠা, সবলের আক্রমণের ভয়, এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পরিপোষক।

কমিউনিষ্ট সমাধান প্রচেষ্টা

পৃথিবীব্যাপী ঐক্য স্থাপনের ইচ্ছা সত্ত্বেও কেন বিরোধ ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে এবং কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা

যেতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আর একটি প্রচেষ্টা হয়েছে মার্ক্স, এঙ্গেলস প্রভৃতি মনীষীদের কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা এবং লেনিন, ষ্ট্যালিন প্রভৃতির সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে।

কেমন করে সকল যুদ্ধের অবসান ঘটান যেতে পারে, এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলছেন ঃ যদিও যুদ্ধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থেই হয়ে থাকে তবু যুদ্ধ বিত্তবানদের ইচ্ছা দ্বারাই সংঘটিত হয় না। বহু দিনের অসংখ্য অর্থনৈতিক কারণের গ্রন্থিই যুদ্ধের জনীয়তা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে এড়িয়ে একদিনে শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এর আগে ধনের ক্ষমতাকে বিচূর্ণ করা এবং সাধারণের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এনে দেওয়া প্রয়োজন।*

লেনিন-বর্ণিত এই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কি? কি করেই বা এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাধারণের হাতে এনে দেওয়া যেতে পারে? এবং এর ফলে কি করেই বা সকল বিরোধের অবসান ঘটা সম্ভব?

---

*"The war is not a product of the evil will of rapacious capitalists although it is undoubtedly being fought only in their interests and they alone are being enriched by it. The war is a product of half a century of development of world capital and its billions of threads and connections. It is impossible to escape from the imperialist war at a bound, it is impossible to achieve a democratie, non-oppressive peace without the overthrow of the power of capital and the transfer of state power to another class, the proletariat."

Lenin—The Tasks of the Proletariat in our Revolution.

রাষ্ট্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন যে, সমাজের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের একটা স্তরে সমাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন কতকগুলি শ্রেণীর উৎপত্তি হয়—সমাজের প্রাথমিক স্তরে সমাজ থেকে একটা পরিবারের মত। এই স্তরে সবাই মিলে কাজ করে, ভোগ করে সবাই মিলে। কিন্তু সমাজ যতই ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যায়, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রচেষ্টা যত বিচিত্রমুখী হয়, সম্পদ যত বাড়ে, নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমলাঘবের পথ যত উন্মুক্ত হয় ততই প্রয়োজন হয় শ্রমবিভাগের। বুদ্ধিজীবীর দল এই সুযোগে কাজের শ্রমসাপেক্ষ দিকটাকে এড়িয়ে কাজের ফলটুকু ভোগ করতে চায়। এর ফলেই সুরু হয় স্বার্থসংঘাত, শ্রেণীসংঘর্ষ। বুদ্ধির জোরে বুদ্ধিমানরা সমাজের অন্য সবাইকে আয়ত্তে রাখার জন্য একটা সংগঠন আবিষ্কার করে নেয়—এই সংগঠনই রাষ্ট্র। আপাতদৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজের মধ্যের পরস্পরবিরোধী স্বার্থসংঘাতকে সংযত করে রাখে, পারস্পরিক বিরোধে সমাজের সমস্ত শক্তিকে ক্ষয়িত হয়ে যেতে দেয় না।*

*"Rather it (state) is a product of society at a certain stage of development, it is the admission that this soeiety has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it is cleft into irreconcilable antagonisms, which it is powerless to dispel. But in order that these antagonisms, classes with conflicting interests, might not consume themselves and society into sterile struggle, a power apparently standing above society became necessary for the purpose of moderating the conflict and keeping it within the bounds of 'order'; and this power arising out of society, but placing itself above it, and increasingly alienating itself from it, is the state." —*Engels—The Origin of the Family, Private Property and the State.*

মার্ক্স রাষ্ট্রের স্বরূপটিকে আরও স্পষ্ট করে আমাদের সামনে ধরেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য সকল শ্রেণীর উপর আধিপত্য করার একটি যন্ত্রবিশেষ। শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে একটি শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ ও পীড়ন করাকে একটা আইন-সঙ্গত রূপ দেয় মাত্র। এতে শ্রেণীবিরোধের কোন সমাধান বিন্দুমাত্র ঘটে না—শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার যন্ত্রস্বরূপ সৈন্যদল, কারাগার প্রভৃতি একটা মনভুলান রূপ নিয়ে থাকে। তবে সংগঠনের ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষের নগ্নরূপটা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। *

কমিউনিষ্ট মতবাদ অনুসারে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক এই রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করে অগণিত জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালিয়ে যায়। সকল বিরোধকে মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করার জন্য এঁদের মতে দুটি পদক্ষেপের প্রয়োজন। প্রথম পদক্ষেপে সংখ্যাগুরু শোষিত নিপীড়িত শ্রেণীকে সংগঠিত করে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তিকে সংখ্যালঘু সমাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। সমাধানের এই পর্যায়ে নিপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ রাষ্ট্র থাকবে, সৈন্যদল, কারাগার—সবই থাকবে। কিন্তু এই পর্যায়ে শোষিত জনসাধারণ শাসন করবে পীড়নকারী সংখ্যালঘু সমাজের লোভকে। লোভ যেখানে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকে আচ্ছন্ন করবে সেখানে জনসাধারণের করায়ত্ত রাষ্ট্রশক্তি নেমে আসবে অমোঘ দণ্ডবিধান

*"According to Marx, the state is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another; it creates 'order', which legalises and perpetuates this oppression by moderating the collisions between the classes."
Lenin—The State and Revolution.

নিয়ে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থায় রক্তপাত হবে সামান্য, শোষণ-পীড়নের সুযোগ থাকবে অত্যল্প ; কারণ, যাদের পীড়ন করা সম্ভব, এই ব্যবস্থায় শাসনের দণ্ড থাকবে তাদেরই হাতে ; সুতরাং পীড়ন করার সুযোগ পাবার আগেই পীড়নকারীর উপর ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসবে। কিন্তু সকল বিরোধ, সকল শ্রেণীসংগ্রাম মেটাবার জন্য এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। তাই দ্বিতীয় পদক্ষেপে শ্রেণীকর্তৃত্বের যন্ত্রস্বরূপ রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই এর সূচনা হবে। সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসবে। এই সশস্ত্র বিদ্রোহই হবে উপরোক্ত অর্থে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে শেষ কাজ। এর পর পীড়ন করার সুযোগ থাকবে না বলে পীড়নের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। সুতরাং, সমাজ-সংগঠনের এই পর্যায়ে বিরোধ ও পীড়নের সাধনস্বরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা, সৈন্য, কারাগার প্রভৃতির অবসান ঘটবে। ব্যক্তিগত লোভ, পীড়নপ্রচেষ্টা যদি কোথাও কখনও মাথা তোলে তবে সশস্ত্র জনসাধারণই তার প্রতিবিধান করতে সক্ষম হবে। *

---

* "...Under capitalism we have a state in the proper sense of the word that is, a special machine for the oppression of one class by another, and of the majority by the minority at that...

"Furthermore, during the transition from Capitalism to Communism suppression is still necessary, but it is now the suppression of the exploiting minority by the exploited

এই আদর্শকে সামনে রেখে, জনগণের নামে রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকের পত্তন হয়েছিল। সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। পৃথিবীর বা কোন জাতির ইতিহাসে এই সময়টুকু নগণ্য, কিন্তু এই প্রচেষ্টার গতি ও প্রকৃতির বিচারের জন্য এই সময়ের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়।

এক দিক থেকে সোভিয়েট কর্মপন্থা অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচেছে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে আতিশয্যও দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রের নিপীড়ন কমেছে। এ দিক থেকে এই কর্মপন্থায় কেবলমাত্র সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা না করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু এতে মূল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে কি? কি করে জগতের কোটি কোটি অসহায় নিপীড়িত লোক,

---

majority. A special apparatus, a special machine for suppression, the 'state', is still necessary, but this is now a transitory state; it is no longer a state in the proper sense; for the suppression of the minority of exploiters by the majority of the wage-slaves of yesterday is comparatively so easy, simple and natural a task that it will entail far less bloodshed than the suppression of the rising slaves......

"Finally, only communism makes the state absolutely unnecessary, for there is no body to be suppressed—"no body" in the sense of a class, in the sense of a systematic struggle against a definite section of the population......

Lenin—The State and Revolution.

যারা রাষ্ট্রের বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী দ্বারা ক্রমাগত নিপীড়িত হচ্ছে—মুক্তি পাবে, তার পথের সন্ধান পাওয়া গেছে কি ?

এ দিক থেকে বিচার করলে কমিউনিষ্ট কর্মপন্থার ব্যর্থতা চোখে পড়বে। যে রাষ্ট্রকে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারায় নিপীড়নের যন্ত্র বলে আখ্যাত করা হয়েছে, সেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং আধিপত্য কমা দূরে যাক, রাষ্ট্র আজ সোভিয়েট ব্যবস্থায় ভগবানের স্থান গ্রহণ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আজ রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে, প্রতিটি ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ আজ চেয়ে আছে রাষ্ট্রের দিকে। তাই নিপীড়নের বিশেষ যন্ত্র, সৈন্যদল, কারাগার প্রভৃতিরও অবসান ঘটেনি। বরং আজ সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, আশা করা গিয়েছিল যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এলেই শ্রেণী-বৈষম্যের অবসান ঘটবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উৎপাদন-ব্যবস্থা আজ সোভিয়েট দেশে জনসাধারণের করায়ত্ত হয়েছে কিন্তু শ্রেণী বিলুপ্ত হয়নি। ওদেশে আজ নূতন নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়নি, পরিচালক ও শ্রমিক আজও স্পষ্টতঃ দুটি ভিন্ন শ্রেণী।

তৃতীয়তঃ, মানুষের মধ্যে বিরোধ দূর করার জন্য কমিউনিজমের কাছে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আশা করা গিয়েছিল, তা হচ্ছে অধিকার সম্পর্কে মানুষের নূতন ধারণা জন্মাবে এই আশা। কমিউনিজমের লক্ষ্য ছিল "From each according to his

ability, to each according to his needs."—সবাই কাজ করবে নিজের সাধ্যমত; আর ভোগ করবে প্রয়োজন অনুসারে। এ আশা পূর্ণ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অর্থনৈতিক উন্নতির আশা নিয়ে যারা একত্রিত হয়েছে তারা ধনসম্পদের মোহ জয় করতে পারে না; তাই দেখি সেখানে কর্মের প্রেরণার উৎস আর্থিক লাভালাভ; কর্মীরা সেখানে কর্মক্ষমতার পরিমাপ করছে আর্থিক মাপকাঠি দিয়ে। সুতরাং সেখানে বেতনের বৈষম্য, ব্যক্তি-গত সম্পত্তি-সবই রয়ে গেছে। লোভকে যেখানে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, সেখানে লোভ আপনা থেকে অবলুপ্ত হতে পারে না। তাই লোভকে সেখানে দমিত করে রাখার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের দণ্ডভয়ের।

চতুর্থতঃ, ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে সশস্ত্র বিদ্রোহ যতটা সহজ ছিল, আজ আর তা নয়। একদিকে আণবিক বোমার অধিকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রায় অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে; অপর দিকে রাষ্ট্রের নিপীড়নেরও আজ রূপান্তর ঘটেছে, সে নিপীড়ন এত সূক্ষ্ম যে, তার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা খুবই কঠিন। সুতরাং সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তিকে করায়ত্ত করে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা আজ স্বপ্নবিলাসের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আজ আমরা বরং দেখতে পাচ্ছি যে, সকল যুদ্ধের অবসান ঘটাবার নামে সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন যুদ্ধকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তেমনি সকল বিরোধের অবসান ঘটাবার নামে কমিউনিষ্টরাও বিরোধকে বাঁচিয়ে রাখছে।

গান্ধীজীর বিশ্লেষণঃ মূল বক্তব্য

শান্তি স্থাপনের জন্য গান্ধীজীর যে প্রচেষ্টা তা কোন নূতনত্ব দাবী

করে না। চিরন্তন সত্যকেই গান্ধীজী বর্তমান জাগতিক পরিবেশে আধুনিক কালের উদাহরণ সহ উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বের শান্তিসমস্যা নিয়ে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল গভীরভাবে চিন্তা করেছে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত অসাম্য আছে; বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, শক্তিতে কোন দুটি মানুষ সম্পূর্ণ এক নয়। ভারতবর্ষে প্রথমাবধি এই বৈচিত্র্য সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই বৈচিত্র্য মাত্রই বিরোধের কারণ নয়। একটি পরিবারে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, থাকে; মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই থাকে। এরা বিচিত্র: এদের ইচ্ছা, প্রয়োজন ইত্যাদিও ভিন্ন। তবু এদের মধ্যে বিরোধ থাকে না, যতক্ষণ না এরা একে অন্যের কর্মসীমায় হস্তক্ষেপ করে। শিশু যখন বাবার দোয়াত, কলম, অফিসের ফাইল নিয়ে খেলা করতে বসে অথবা বাপ-মা যখন শিশুর বড়সাধের ঝিনুক, বোতাম, কাগজ প্রভৃতিকে আবর্জনার স্তূপ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তখনই বিরোধ বাধে। একে অন্যের কর্মসীমায় হস্তক্ষেপ করে যাতে বিরোধ না বাধায় বহু অভিজ্ঞতার ফলে হিন্দুরা তার এক উপায় বের করেছিলেন বর্ণাশ্রম-প্রথার মধ্য দিয়ে। মানুষ মাত্রেই জন্মায় শক্তি, চিন্তা ও অনুভূতি কতকগুলি সীমা নিয়ে। সেই সীমার ভিতর যদি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের পথ থাকে তবে বিরোধের প্রয়োজন থাকে না। বর্ণাশ্রম যদি জন্মগত না হয়ে গুণগত হয় তবে তা যে বিরোধের সমস্যার অনেকখানি সমাধান করতে পারে, এ কথা গান্ধীজী পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন।*

*"I believe that every man is born in the world with certain natural tendencies. Every person is born with certain

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে পরিপূর্ণভাবে পাবার আর একটি ভিত্তি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল। সে হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি। জড় জীবন্ত সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্রহ্মদর্শনের সাধনাকে ভারতবর্ষ ঐক্যসাধনার মূল কথা বলে জেনেছে। তাই ভারতবর্ষ বৈচিত্র্য এবং শ্রেণীভেদ দূর করার অসম্ভব প্রচেষ্টা না করে মানুষের মধ্যে ভালবাসার যে বীজটি আছে তাকে অঙ্কুরিত করতে চেয়েছে। তাই ভারতের এক কবি বলছেন :

উমা জী রামচরণরত
বিগত কাম মদ ক্রোধ
নিজ প্রভুময় দেখহি জগত
কাইসন করহি বিরোধ।

ভারতবর্ষ তাই উপদেশ দিয়েছে সকল কর্মীকে সেবার ভাব, পূজার ভাব নিয়ে কর্ম করতে, আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করে যেতে। এই ভাবটিকে গান্ধীজী শান্তিস্থাপনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। বাইরে যে ব্যবস্থাই থাক না কেন, মানুষ যদি অন্তরে

limitations which he cannot overcome. From a careful observation of those limitations the law of Varna was deduced. . . . . While recognising limitations the law of Varna admitted of no distinctions of high and low ; on the one hand it guaranteed to each the fruits of his labours and on the other it prevented him from pressing upon his neighbour. This great law has been degraded and fallen into disrepute. But my conviction is that an ideal social order will only be evolved when the implications of this law are fully understood and given effect to."

—*The Modern Review*, Oct. 1935

অহিংসার ভাবকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে যে কোন অবস্থায় পরকে পীড়ন করার উপায় সে আবিষ্কার করে নিতে পারে। বিরোধের মূল সূত্র আছে মানুষের মনে। সেই মন থেকে সাধনার দ্বারা বিরোধের চিন্তাকে দূরীভূত করতে হবে। এ সাধনায় সিদ্ধি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, এ কথা গান্ধীজী স্বীকার করেছেন। কিন্তু অন্য পথে বিরোধ দূর করা যে সহজ নয় তার সাক্ষী ইতিহাস। হিংসার পথে বিরোধ দূর করায় চেষ্টায় শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে কিন্তু শান্তি মরীচিকাই রয়ে গেছে।

গান্ধীজী এজন্য পথের উপর জোর দিয়েছেন। মানুষ মাত্রেই তার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় শান্তি কামনা করে, আসল সমস্যা পথ নিয়ে। কোন্ পথে গেলে মানুষ শান্তি লাভ করবে! কোন্ পথে গেলে বিরোধের অবসান ঘটবে অথচ শক্তির পূর্ণ বিকাশ হবে! মানুষ বার বার হিংসার পথে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছে, জোর করে বিরোধের অবসান ঘটাতে চেয়েছে। সে পথে সার্থকতা কখনও আসেনি। গান্ধীজী দেখিয়েছেন যে কর্মের উপর আমাদের অধিকার আছে, কর্মফলের উপর নয়। আমার কর্মের দ্বারা আমি একটা বিশেষ পথে এগিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সমগ্র সমাজ একইভাবে কর্ম করে যাবে, একই ফল লাভ করবে, তা নাও হতে পারে। আর জোর করে সকলকে এক পথে পরিচালিত করতে গেলে, এমন জটিলতার সৃষ্টি হয়, এমন বিরাট হিংসার প্রতিষ্ঠা হয় যে, তাতে শান্তি ও স্বাধীনতার সূত্রগুলি সব হারিয়ে যায়। জোর করে মঙ্গল করা যায় না, তাতে মানুষের মনুষ্যত্বকেই শুধু খর্ব করা হয়; প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই যে বিরোধের প্রতি বিতৃষ্ণার বীজ আছে তা তাকে

ভুলিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ এর ফলে নিজেকে হিংস্র বলেই ভাবতে শেখে, আর রাষ্ট্রদণ্ড তার উপর কায়েম হয়ে বসে। সেজন্য সশস্ত্র বিদ্রোহকে গান্ধীজী শান্তি স্থাপনের পথ বলে স্বীকার করেননি, তাঁর মতে আত্মসংযমের শিক্ষাই শান্তি স্থাপনের একমাত্র পথ। রাষ্ট্রের চাপ যে বাইরের চাপ এবং রাষ্ট্রের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ যতদিন থাকবে ততদিন যে শান্তি নেই, বিরোধের অবসান নেই, এ সম্পর্কে গান্ধীজী মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত। কিন্তু রাষ্ট্রের আত্মবিলুপ্তির জন্য মার্ক্স যে পথনির্দেশ করেছেন তার সঙ্গে একমত নন। সম্ভাব্যতার অথবা শ্রেয়স্করতার দিক—কোন দিক থেকেই গান্ধীজী সশস্ত্র বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। আজকার সশস্ত্র, সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লুকিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠন করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, লুকিয়ে কাজ করার মধ্যে যে অন্যায় আছে, বিরোধের, ঘৃণার বীজকে সযত্নে পুষে রাখার সম্ভাবনা আছে, মানুষের অমঙ্গল সৃষ্টির জন্য তার প্রভাব অতি ব্যাপক বলেই গান্ধীজীর ধারণা।

বিরোধ দূর করতে হলে প্রথমাবধিই বিরোধের পথ ত্যাগ করতে হবে, এই হচ্ছে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত। গায়ের জোরে শান্তি স্থাপন করা যায় না, সাধনা দ্বারা শান্তি স্থাপন করতে হয়। বিরোধের দ্বারা অন্যায়কারীকে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু অন্যায়কে জয় করা যায় না। অন্যায়কে জয় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে অন্যায়ের অনুশীলন থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। হিংসার পথে শান্তি স্থাপন করতে গেলে, ফললাভ হক আর নাই হক, প্রথমাবধিই নিপীড়ন, অন্যায়, মিথ্যাচার জমা হতে থাকে, প্রথমাবধিই জীবনক্ষয় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

অন্যায়ের এই বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া গেছে, এর কোন উদাহরণ ইতিহাসে নেই। যুদ্ধ কেবল অন্তহীন যুদ্ধেরই জনয়িতা, হিংসা থেকে কেবলমাত্র বৃহত্তর হিংসাই জন্মলাভ করে, এই হচ্ছে গান্ধীজীর অভিমত। তাঁর মতে বর্তমান জীবনযাত্রা, বর্তমান রাষ্ট্র এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে হিংসার উপর; সুতরাং কেবলমাত্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব পরিবর্তনের উপর নয়, সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপরই সম্পূর্ণ বিপ্লব নির্ভর করে। সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা বঞ্চিতদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এনে দিলেই পীড়ন এবং শোষণের অবসান ঘটবে না: কারণ, আজ যারা বঞ্চিত তাদের মধ্যেও ঐ একই ভাব বিরাজ করছে, তারাও চায় ভোগপূর্ণ জীবন, কম কাজ করে অধিকতর ফললাভের তারাও প্রয়াসী, তারাও শরীর-শ্রমকে ছোট এবং বুদ্ধিজীবীর জীবনকে বড় মনে করে। এই ভাবটির উচ্ছেদ-সাধনের আগে সমাজের প্রকৃত রূপান্তর ঘটা সম্ভব নয়। মানুষ আত্মজয়ের দ্বারাই এই ভাবকে উৎপাটিত করতে পারে। সুতরাং গান্ধীজীর মতে স্বরাজলাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মকর্তৃত্ব অর্জন।*

---

*"I would destroy the system to-day, if I had the power I would use the most deadly weapons, if I had believed that they would destroy it. I retrain only beacuse the use of such weapons would only perpetuate the system though it may destory the present administrators. Those who seek to destroy men rather than manners, adopt the latter and become worse than those whom they destory under the mistaken belief that the manners will die with the men. They do not know the root of the evil."

—*Young India*, 17-3-27.

"Government over self is the truest Swaraj."

—*Young India*, 8-12-20.

বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে গান্ধীজী দেখিয়েছেন যে, আত্মশাসনের পথে স্বারাজ লাভে এই ব্যবস্থাগুলিই প্রধান অন্তরায়। বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে: ব্যাপকতা ও জটিলতা। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচরণ, উৎপাদন ও বণ্টন, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্ববিষয়েই আজ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। এই ব্যাপক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে আজ ব্যাপক করতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থা হয়েছে অত্যন্ত জটিল। ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকে আজ চালান হচ্ছে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সহযোগিতার নিদর্শন বলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই জটিলতার ফলে জনসাধারণের মতামত আজ ক্রমশঃই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই জটিল ব্যবস্থার কর্ণধার যাঁরা, সেই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর হাতেই আজ রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা। প্রত্যেক রাষ্ট্রে আজ একটি অন্দরমহল আর একটি বাইরের মহল রয়েছে, কূটনৈতিক ব্যবস্থার নামে মিথ্যাচারকে সম্ভ্রান্ত পোষাক পরান হয়েছে। গোপনীয়তার অন্তরালে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মঙ্গলচিন্তায় প্রাণপাত করছেন। প্রকাশ্যে যদি ফলাও করেও তাঁরা মিথ্যা বলেন, মিথ্যা আচরণ করেন, তাও নাকি করা হয় জনগণের মঙ্গলের জন্য; সরলতা সহজতা আজ অচল। কয়েকটি রাষ্ট্রের কর্ণধাররা জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিচারের একচেটিয়া অধিকার নিজেদের হাতে গ্রহণ করলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বর্তমানে নির্বাচনের একটা প্রহসন আছে। কিন্তু বিচারের সুযোগ নেই জনসাধারণের, প্রচারের যন্ত্রগুলি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, হাতের অস্ত্র আর ভাতের অস্ত্রও ঐ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে, আশৈশব শিক্ষার ভিতর দিয়ে দলীয় আদর্শকে লোকের মনে

প্রতিষ্ঠা করার অধিকারও তাঁদের। সুতরাং, নির্বাচনের আগে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী পৃথিবীর অবস্থাটা যা বুঝিয়ে দেন সেইটে পুরাপুরি বিশ্বাস করা ছাড়া লোকের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। সর্বোপরি এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের মনে এই ভাবটিই অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা করা হয় যে, যে রাষ্ট্রে জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামানর কাজটা জনসাধারণকে যত কম করতে হয় সে রাষ্ট্র তত প্রগতিশীল। ফলে জনসাধারণের মনে রাষ্ট্রীয় প্রগতির নামে নিজেদের জীবন-মরণের সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করা সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিচ্ছে, প্রতিটি সামান্য বিষয়ের ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করবে, এই ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। সুখের আফিং খেয়ে জনসাধারণ ঝিমুচ্ছে, আর স্বাধীনতার চাবিকাঠি গিয়ে উঠছে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর হাতে।

এই অবস্থাটাকে বুদ্ধিমানেরা আরও জটিল করে তুলেছেন ক্রমাগত অধিকতর মারাত্মক মারণাস্ত্র তৈরী করে। কোটি কোটি লোকের মতকে নিছক পশুশক্তি দ্বারা স্তব্ধ করে দেবার মত অস্ত্র জমে উঠছে মুষ্টিমেয় লোকের ঘরে। অ্যাটম বোমার সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। শান্তি স্থাপন কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আপন মতে আপন পথে অন্ধবিশ্বাসী গর্বান্ধ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী আজ এগুলি নিয়ে মারাত্মক খেলা খেলতে পারে। আজ জনসাধারণেরই মঙ্গলের নামে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি একে অন্যের উপর আণবিক অস্ত্রের শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। এতে জনসাধারণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাতে ক্ষতি নাই, তবু নাকি এতেই তাদের মঙ্গল হবে। জনসাধারণের কণ্ঠস্বর ক্রমেই অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

উৎপাদনের-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলেও আমরা এই একই জিনিস দেখতে পাব। উৎপাদনের জন্য বহুলোকের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন আজ ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। উৎপাদনের যন্ত্রগুলি মানুষের শ্রম দূর করছে, পর্যাপ্ত উৎপাদনের দ্বারা মানুষের শ্রীহীনতা দূর করছে, এটাই আজ বড় কথা নয়, উৎপাদনের যন্ত্রগুলি ক্রমেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করছে, এইটাই হচ্ছে আজ সবচেয়ে বড় কথা। শ্রমজীবীর প্রয়োজন আজ ক্রমেই কমছে, 'রবট'রাই আজ তাদের স্থান দখল করতে পারে। গায়ে খেটে এতদিন যারা উৎপাদন করেছে তারা আজ পরিণত হতে চলেছে পরগাছায়। এদের প্রাণপাত পরিশ্রমে তৈরী যন্ত্র দিয়ে বুদ্ধিমানরা বিপুল বেগে উৎপাদন করবে, আর এরাই দাঁড়াবে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে, প্রচুর ভিক্ষা পেয়ে হয়তো বা জয়ধ্বনিও করে যাবে। তবে, অন্য দিকে রব উঠেছে, যে বিপুল বেগে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে তার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া নাকি কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং একদিন যদি ফসল নষ্টকারী ইঁদুর বাঁদরের মত প্রয়োজনহীন এককালের শ্রমজীবীদেরও বিনষ্ট করা প্রয়োজন হয়, তবে তাকেও বোধ হয় বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা চলবে।

এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি। তা হচ্ছে এই যে, সভ্যতা আজ যে পথে চলেছে এ হচ্ছে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর পায়ে অগণিত জনসাধারণের আত্মসমর্পণের পথ। এ আত্মসমর্পণ আমাদের ঐশ্বর্যের দিকেও নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ পথ কোনক্রমেই জনসাধারণকে আত্মগৌরব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যেতে পারে না। জ্ঞাতসারে হক, অজ্ঞাতসারে হক,

আজ জগৎ জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার।

গান্ধীজীর কল্পিত সমাজ

গান্ধীজীর মতে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের দিক থেকে বিচার করলে এই নীতিকে কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না। অধিকাংশ মানুষ পরগাছায় পরিণত হবে, আর মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমানের কৃপার জন্য তাদের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকবে, এ মানুষের নিয়তি নিশ্চয়ই হতে পারে না। অথচ সভ্যতা আজ দুর্বার গতিতে এই পথেই মাতালের মত এগিয়ে চলেছে। এর অবশ্যম্ভাবী কুফল থেকে মুক্ত হতে হলে এই পথকে সম্পূর্ণরূপেই বর্জন করতে হবে। এমন সমাজ আমাদের গড়ে তুলতে হবে যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির সৎশ্রমের প্রয়োজন থাকবে। প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকবে। কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকাশ, তার বিকাশের পথ। সুতরাং, এই সমাজে প্রত্যেক মানুষেরই তার উপযুক্ত কর্ম করার ব্যবস্থা থাকা চাই। জটিলতাকে সম্পূর্ণভাবে এড়ান আজ আর সম্ভবও নয় এবং তাতে যে মঙ্গল আছে তা ভাববারও কারণ নেই। কিন্তু জটিল ব্যবস্থার উপর যাতে আমাদের জীবনের অপরিহার্য ব্যবস্থাগুলি একান্তভাবে নির্ভরশীল না হয়, তার ব্যবস্থা করতেই হবে। জটিলতা আর সরলতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা চাই। জীবনের পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য তার ব্যবস্থা হবে সরল, তার কর্তৃত্ব থাকবে জনসাধারণের হাতে। এ হলে পদে পদে বুদ্ধিমানের খপ্পরে পড়ে দিশেহারা হবার প্রয়োজন জনসাধারণের থাকবে না। তখন

জটিল ব্যবস্থা, জটিল উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের যে সহ-যোগিতা তা হবে স্বেচ্ছাপ্রসূত, তাই প্রকৃত। আজকের সমাজে রাষ্ট্রের কর্ণধার আর জনসাধারণের মধ্যে, উৎপাদনযন্ত্রের পরিচালক আর শ্রমিকের মধ্যে যে সহযোগিতা তা ছদ্মবেশী প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক মাত্র—এক পক্ষ এখানে অসহায়, একান্তভাবে অপর পক্ষের উপর নির্ভরশীল। তাই গান্ধীজী অন্ন, বস্ত্র, আবাস, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন যন্ত্রের ব্যবহার চেয়েছেন যা জনসাধারণের সাধ্যায়ত্ত, যার জন্য পদে পদে অতি-বুদ্ধিমানদের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ঘটবে না, যে যন্ত্রে উৎপাদন করে উৎপাদনকে এমনভাবে স্তূপীকৃত করা চলবে না যাতে অন্যকে বাধ্য করে পদানত করে রাখা যায়। সামান্যসংখ্যক ব্যক্তিই প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। প্রতিভা অসৎ পথে পরিচালিত হলে কিভাবে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে এবং কিভাবে জনসাধারণ প্রতিভাবানদের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করে সভ্যতাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, গান্ধীজী তারই পথ নির্দেশ করেছেন।

উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের ফলে হয়তো জনসাধারণের স্বার্থ নিষ্কণ্টক করার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে, কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের পরিপূর্ণতা বিকাশের সুযোগ ঘটবে। কিন্তু তখনও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিভাবানদের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে কি? সভ্যতার প্রগতিতে প্রায় সবটুকুই প্রতিভাবানদের দান। সুতরাং প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারলে নিশ্চয়ই অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

গান্ধীজীর সমাজ-পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিভাকে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করে তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে। শরীরের একটি প্রত্যঙ্গ যদি সমগ্র দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে না। প্রতিভার ক্ষেত্রেও একাভিমুখী বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধির প্রাচুর্যকেই আমরা প্রতিভার লক্ষণ বলে মনে করি, ধনসম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েই প্রতিভার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নয়, সত্যকে উপলব্ধি করার মধ্যে, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই কবিগুরু বলেছেন, "ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মত বলতে পেরেছে, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্', সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকার সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে।'* মানুষকে এই আদর্শে

* According to me the economic constitution of India and for the matter of that of the world, should be such that no one under it should suffer from want of food and clothing. In other words everybody should be able to get sufficient work to enable him to make the two ends meet and this ideal can be universally realized only if the means of production of elementary necessaries of life remain in the control of the massess. These should be freely available to all as God's air and water are or ought to be. They should not be made a vehicle to traffic for the exploitation of others. Their monopolization by any country, nation or group of persons would be unjust." *Young India*, 15-11-28.

প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হবে প্রতিভা বিকাশের লক্ষণ। প্রতিভার সার্থকতাকে অর্থের মানদণ্ড দিয়ে বিচার না করে এই পরিপূর্ণ বিকাশের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে হবে।

লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার উপায়

এই সমাজাদর্শকে রূপায়িত করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের বিচারের মান আমূল পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তন আইনের জোরে অথবা রাষ্ট্রের পাশবশক্তির দ্বারা করা সম্ভব নয়। বাইরের চাপে ক্রীতদাস সৃষ্টি করা সম্ভব, সত্যসন্ধানী মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

এই পরিবর্তন সংসাধিত হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে। সে হচ্ছে স্বাধীন শিক্ষার পথ। গুরুর কাছে শিষ্য এসে জুটবে, গুরুর জীবন থেকে শিষ্য গ্রহণ করবে শিক্ষা, গুরুর আদর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে শিষ্যের জীবন। শুধু এর মধ্য দিয়েই নূতন সমাজের যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠতে পারে। যোগ্য গুরুর কর্মে সহায়তা যদি রাষ্ট্র দিতে পারে তবে ভালই, কিন্তু এর বেশী কিছু করলে চলবে না। তাতে ছাপটাই হয়ে উঠবে বড়, গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে গৌণ। গান্ধীজীর বহু পূর্বে ১৯০১ সালে নূতন মানুষ গড়ার এই পথের সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার্থীদের তিনি ডাক দিলেন নূতন জীবন, নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য, তিনি নিজে গ্রহণ করলেন গুরুর আসন। শিক্ষার্থীদের তিনি বললেন,

"আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে

মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাই কবিগুরু বলেছেন, "ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মত বলতে পেরেছে, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্', সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকার সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে।'* মানুষকে এই আদর্শে

* According to me the economic constitution of India and for the matter of that of the world, should be such that no one under it should suffer from want of food and clothing. In other words everybody should be able to get sufficient work to enable him to make the two ends meet and this ideal can be universally realized only if the means of production of elementary necessaries of life remain in the control of the massess. These should be freely available to all as God's air and water are or ought to be. They should not be made a vehicle to traffic for the exploitation of others. Their monopolization by any country, nation or group of persons would be unjust." *Young India*, 15-11-28.

সম্ভব নয়। বাইরের চাপে ক্রীতদাস সৃষ্টি করা সম্ভব, সত্যসন্ধানী মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

এই পরিবর্তন সংসাধিত হতে পারে একটি মাত্র উপায়ে। সে হচ্ছে স্বাধীন শিক্ষার পথ। গুরুর কাছে শিষ্য এসে জুটবে, গুরুর জীবন থেকে শিষ্য গ্রহণ করবে শিক্ষা, গুরুর আদর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে শিষ্যের জীবন। শুধু এর মধ্য দিয়েই নূতন সমাজের যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠতে পারে। যোগ্য গুরুর কর্মে সহায়তা যদি রাষ্ট্র দিতে পারে তবে ভালই, কিন্তু এর বেশী কিছু করলে চলবে না। তাতে ছাপটাই হয়ে উঠবে বড়, গুরু-শিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে গৌণ। গান্ধীজীর বহু পূর্বে ১৯০১ সালে নূতন মানুষ গড়ার এই পথের সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার্থীদের তিনি ডাক দিলেন নূতন জীবন, নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য, তিনি নিজে গ্রহণ করলেন গুরুর আসন। শিক্ষার্থীদের তিনি বললেন,

"আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে

সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন পোষণ করবে।

"আজ থেকে তোমাদের অভয় ব্রত! ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নাই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না—কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

"আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মত পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

"আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভাল হয় তাই তোমাদের কর্তব্য, সেজন্য নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

"এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত……"*

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ দিয়েছেন এই আদর্শকেই সামনে রেখে। তিনিও চাইছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনকে স্পর্শ করতে। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরও আশা, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি নূতন যুগের নূতন মানুষ জন্মলাভ করে, তবে অশান্তিবিক্ষুব্ধ পৃথিবী ভারতের বাণী গ্রহণ করে অমৃতের সন্ধান পেতে পারবে।

---

* ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ।

রবীন্দ্রনাথের চাইতে গান্ধীজীর সুবিধা ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার ফলাফল গ্রহণের সুযোগ তাঁর ছিল, বিশ্বভারতীর সংগঠন ও তাহার ফলাফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে তিনি পেরেছিলেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসবে বলতে শুনি, "যে কারণেই হক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্য কর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটিকে গ্রহণ করতে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।"*

প্রারম্ভিক যুগের কথা স্মরণ করে সেদিন তিনি বলেছেন, "সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোন কাজ ছিল না, যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে······সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।"**

তাই বড় বেদনায় তাঁকে সেদিন আহ্বান জানাতে শুনি, "আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করো না—একে স্বীকার করে নাও।"***

রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা এবং গান্ধীজী কিভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন করতে চেয়েছেন তার বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব :

(১) রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তপোবনের নির্জনতায় শিক্ষাসাধনার

* বিশ্বভারতী, পৃঃ .৫৪

** বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৫৫

*** বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৫৬

আসন পাততে। তাঁর ভরসা ছিল সেখানে থেকে সাধনার আলো সমগ্র বিশ্বে বিচ্ছুরিত হবে। সেই নির্জনতার সুযোগ নিয়েই রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসহীন লোকেরা সেখানে গিয়ে ভিড় করেছে। ফলে শিক্ষার পীঠস্থানেও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের রূপায়নের পথ আজ নেই। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিশ্বভারতীরই মূলরূপ আজ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে; আর সেটাকেই বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশ বলে আমরা গ্রহণ করছি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে গভীর সম্পর্কের ফলে শিষ্যের সমগ্র জীবনকে স্পর্শ করা যায়, সেই যোগাযোগ সাধনই ছিল আশ্রমের মূল কথা, শিক্ষার ছাপটা ছিল অবান্তর, সকল আয়োজন উপকরণ ছিল ঠিক ততটুকু যাতে যোগাযোগ কোথাও ব্যাহত না হয়। আজ উপকরণ স্তূপীকৃত হচ্ছে, ছাপের মূল্য বেড়েছে, কিন্তু গুরুশিষ্যের প্রাণের যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে।

গান্ধীজী তাই শিক্ষাসাধনার আসন পাততে চেয়েছেন সাত লাখ গ্রামে। সেখানে ভিড় বাড়িয়ে কৃত্রিম বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ স্বল্প। গুরুর সঙ্গে সেখানে মাটির যোগ হবে নাড়ীর যোগ, ফলে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দীর্ঘকালব্যাপী যোগাযোগ হবে স্বাভাবিক। এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড আলো জ্বেলে বিশ্বভুবনকে আলোকিত করার পরিবর্তে সর্বত্র মাটির প্রদীপ জ্বালায় গান্ধীজী বিশ্বাসী। সেজন্য গান্ধীজী মনে করেছে যে, মূলনীতি ঠিক থাকলে সহস্র কেন্দ্রের বৈচিত্র্যময় পরীক্ষা থেকে মূল সমাধানের সন্ধান সহজে পাওয়া যাবে।

(২) রবীন্দ্রনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণসত্তায়। সেজন্য তিনি সর্বদাই কৃতবিদ্য লোক পেলেই তাঁকে সমাদর করে স্থান দিয়েছেন তাঁর সাধনাক্ষেত্রে। একটা বিশেষ

আদর্শে সবাই শুধু সায় দিয়ে যাবে, এ ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই অশ্রদ্ধেয় মনে করেছেন; কিন্তু তিনি বারবার ভুলে গেছেন যে একটা আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী না হলে একটা সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। ফলে "ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে" যে "জনতার মান রক্ষা" করতে তিনি কোনদিন চাননি, সেই জনতাই ভিতর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রকে অধিকার করে বসেছে। একটা আদর্শকে সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এমন সময় এল যখন ঐ আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীর সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল মুষ্টিমেয়। তাই সেদিন বিশ্বভারতী থেকে যে আহ্বান এল— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা—তাতে গুরুর কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া গেল না, তাতে রইল জনতারই কলরব।

গান্ধীজী কিন্তু সত্যসাধনার ক্ষেত্রে আদর্শের শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেননি। সত্যকে ভোটের জোরে চেনা যায় না, সত্যসাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর কাছ থেকেই সত্য পথে চলার প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি এই নির্দেশগুলি সুস্পষ্টভাবে দিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, (ক) বৌদ্ধিক শ্রম এবং শারীর শ্রমের মধ্যেকার প্রাচীরটি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। বৌদ্ধিক শ্রম শারীর শ্রম থেকে বড় এবং আয়ের দিক অধিকতর লাভজনক, এ মনোভাব যতদিন থাকবে ততদিন লোক সর্বদাই শারীর শ্রমকে এড়াতে চাইবে। বৌদ্ধিক এবং শারীর শ্রম স্ব স্ব ক্ষেত্রে সম-মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয়, এ বোধ শুধু মুখে নয়, কার্যতঃ স্বীকার করা চাই। এজন্য প্রত্যেককে প্রত্যহ খানিকটা অন্নশ্রম করতেই হবে। বুদ্ধির জোরেই মানুষ শারীর শ্রমকে ফাঁকি দিয়েছে, শ্রম-

জীবীকে ঠকিয়েছে। এটা দূর করতে হলে, শোষণের পথ বন্ধ করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করতে হলে সানন্দে শারীর শ্রম করার কাজে প্রত্যেকের অভ্যস্ত হওয়া চাই। *

(খ) দ্বিতীয়তঃ সত্য সাধনার জন্য স্বাবলম্বনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী উভয়েই স্বীকার করেছেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে থাকলে বাইরের চাপে অনেক সময় সত্য পথ থেকে বাধ্য হয়ে ভ্রষ্ট হতে হয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন যে, আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত শ্রমে উপার্জিত অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া চাই। † নানা মতবাদের লোক বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করায় এই মূল কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। ফলে বিশ্বভারতীকে আজ ক্রমেই বাইরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। গুরুর কাছে জীবনকে গড়ে তুলতে আজ আর কেউ এখানে আসে না। প্রতিষ্ঠানকে অর্থের জন্য যাদের উপর নির্ভর করতে হয়, তাদের মনোমত করেই শিক্ষা পরিবেশন করতে হয়। তাই বিশ্বভারতীর বাণী আজ আর শোনা যায় না।

গান্ধীজী তাই স্বাবলম্বনের নীতির উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন ; একেই বলেছেন নঈ তালিম শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতার চরম পরীক্ষা

* "Intellectual work is important and has an undoubted place in the scheme of life. But what I insist on is the necessity of physical labour. No man, I claim, ought to be Free from that obligation. It will serve to improve even the quality of his intellectual output. *Harijan*, 23-2-47

† The Centre of Indian Culture—Rabindranath Tagore.

(self-support is the acid test of its reality). অন্ন, বস্ত্র; আবাস ও পরিচ্ছন্নতা এগুলি মানুষের জীবনে অপরিহার্য। তাই এ-সব শিল্পকাজ শেখার মধ্য দিয়েই শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে যে কেবল ভিক্ষা চেয়ে ধর্ম খোয়ানর আকাঙ্ক্ষা ঘুচবে তাই নয়, এর ফলে ভাবীকালের যোগ্য শিল্পশিক্ষারও গোড়াপত্তন হবে, এবং প্রত্যেক শশুর আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত হবে।

(গ) তৃতীয়তঃ, এ কাজে প্রয়োজন হিসাবে বণ্টনের নীতি মেনে নিতে হবে। গান্ধীজীর মতে রাষ্ট্র হবে আমাদের স্বাধীন মিলনের ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। জোর করে বা চাপ দিয়ে রাষ্ট্র কিছু করাবে না। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ যাতে বড় হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে প্রথমাবধি দৃষ্টি দিতে হবে ; তা না হলে সমাজ থেকে অর্থের বর্তমান প্রাধান্য দূর করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। উৎপাদন করবেন সকলে মিলে ; উৎপাদনটাই হবে উৎপাদনকারীর আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের পথ ; যোগ্যতার প্রতিদান হবে সম্মান, ভালবাসা—এই শিক্ষাদ্বারা অর্থকে কৃতিত্বের মান হিসাবে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করতে হবে। গুরুকে আবার ব্রাহ্মণের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, দারিদ্র্যকে তাঁর জয় করতে পারা চাই শ্রমদ্বারা, কিন্তু লক্ষ্মীর পায়ে তাঁর মাথা লুটিয়ে দিলে চলবে না। সুতরাং, এ কাজে প্রত্যেক কর্মীর এ বোধ থাকা চাই যে, বণ্টন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনই হবে মাপকাঠি।

এই তিনটি মূল নীতি মেনে নিয়ে যেখানেই শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হবে, তাকেই গান্ধীজীর শিক্ষানীতির প্রয়োগ বলা চলতে পারে। এর একটি নীতিও উপেক্ষা করলে চলবে না ; কারণ, এই নীতিগুলি একটি অবিভাজ্য শিক্ষা ও সমাজ দর্শনের অঙ্গ।

নঈ তালিমের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সমাজ-পরিকল্পনার রূপায়ন

নঈ তালিমের শিক্ষাকাল হল জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত। এর প্রথম পর্যায় হল প্রাক্‌বুনিয়াদী পর্যায়ঃ এই পর্যায়ে ২½ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুরা শিক্ষালাভ করবে। এরা গ্রামের অন্যান্য শিশুর সঙ্গে শিক্ষক ও গ্রামের সহকারিণীদের তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়ে উঠবে। তখন থেকেই এরা প্রকৃতির কোলে স্থানীয় উপকরণাদি নিয়ে খেলাধূলার মাধ্যমে দেহে মনে ভাবী কাজের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় পর্যায় হল বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায়। এই পর্যায়ে শিক্ষা পাবে ৬+ থেকে ১৪+ বৎসর বয়সের কিশোরকিশোরীরা। এই আট বছরে সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি শিশু পাবে স্বাবলম্বনের শিক্ষা। এই শিক্ষাশেষে এদের অধিকাংশ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে সংসারক্ষেত্রে। তারা কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের সবচেয়ে ভাল সেবা করতে পারবে তা স্থির করা হবে তাদের বিদ্যালয়ের আট বছরের কাজের বিজ্ঞানসম্মত হিসাব থেকে। এদের প্রতিষ্ঠিত করার ভার নেবে গ্রামসমাজ। সেজন্য বয়স্কশিক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রামসমাজকে প্রথমাবধি শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে কোন কাজ গ্রহণ করতে এদের আপত্তি থাকার কারণ থাকবে না; কারণ, পেশার জন্য আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধি কিংবা সামাজিক সম্ভ্রমের তারতম্য কিছুই হবে না। এ মনোভাব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আট বছর ধরে সকল কাজ শিক্ষামূলকভাবে করার অভ্যাস থেকে জন্মাবে আশা করা যায়, এমন কি যে-কাজে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মেছে, সে-কাজ করতে তার বিশেষ আগ্রহই দেখা যাবে বলে মনে করা যায়।

এই পর্যায়ে যারা শিক্ষা শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, গ্রাম-সমাজের কর্তৃত্ব থাকবে তাদেরই উপরে। যুদ্ধের উপকরণ এরা প্রস্তুত করবে না এবং বৃহৎ যন্ত্রের অত্যধিক প্রাদুর্ভাবে এদের বাধ্যতা ক্রয় করতে পারবে না, ক্রমাগত শিক্ষার ফলে স্বাধীনতা বিক্রয়ের বদলে এরা বরং মৃত্যুকে বরণ করতে শিখবে। সমগ্র পৃথিবীতে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হলে যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে, এ-রকম একটা অঙ্গীকার কমিউনিষ্টরা করে থাকেন। পরলোকে সুখ পাওয়ার আশার চাইতে এটা কোনক্রমেই অধিক নিশ্চিত নয়। গান্ধীজী শুধু দেখিয়েছেন যে পথ, ঐ পথে চললে আজই, এই মুহূর্ত থেকেই, শান্তির দিকে পদক্ষেপ করতে আরম্ভ করতে পারি।

তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে উত্তরবুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যারা কোন না কোন দিকে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের বিশেষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে এই পর্যায়ে। সাধারণ শিল্পকাজগুলির পরিমাণ এ পর্যায়ে কমলেও অভ্যাস সম্পূর্ণ ছাড়া চলবে না। এই পর্যায়ের শিক্ষাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজের সেবায় লাগান চলবে আর প্রতিষ্ঠানগুলি বহন করবে কর্মীর ব্যয়—শিক্ষার মাপকাঠি দিয়ে হিসাব করে না, প্রয়োজনের হিসাব করে। শিক্ষা দেবে সম্মান, কর্মের ও শিক্ষার সুযোগ, অর্থ নয়।

চতুর্থ পর্যায়ে যাঁরা শিক্ষা পাবেন তাঁরা হচ্ছেন গবেষক। এঁদেরও কাজ হবে নিজের শিক্ষা দিয়ে সমাজের সেবা করা। তা না হলে এঁরা সমাজের সেবা পাবেন না। সমাজে অন্য লোক থাকবেই,

তারা শান্তিকেও নিশ্চয়ই বিঘ্নিত করবে, কিন্তু এজন্য কমিউনিষ্ট-পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র জনসাধারণের প্রয়োজন হবে না, সামাজিক দণ্ডই যে-কোন অন্যায়কারীকে জব্দ করতে পারবে।

গ্রামসমাজে এইভাবে স্বাধীন সত্তা নিয়ে প্রয়োজন হলে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবে, আবার কোথাও প্রয়োজন হলে মুহূর্তে সকল যোগাযোগ ছিন্ন করতে পারবে। গ্রামের অর্থ দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হবে না, দিল্লীর প্রয়োজনীয় অংশ গ্রামপ্রতিনিধির মারফতে দিল্লীতে বা যেখানেই হক, পাঠালেই চলবে। দলাদলি প্রাদেশিকতা ঘুচবে, সত্যকার কাজের প্রয়োজনবোধ আসবে। অনাবশ্যক জটিলতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের আকাশচুম্বী কাঠামোটা শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আমরা গান্ধীজীর শিক্ষা ও সমাজকে উপেক্ষা করে তাঁর সত্য ও অহিংসার প্রতিষ্ঠা চাইছি। আমাদের অজস্র ভ্রান্তির দিকে চেয়ে আজ তার কারণ চিন্তা করা দরকার।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ

বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা। কোন না কোন হাতের কাজকে কেন্দ্র করেই এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবেশন করা হয়। কিন্তু অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার মত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবেশন করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়। বই পড়ার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা হয় তার চেয়ে কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা হয় তা যে অনেক স্বাভাবিক ও স্থায়ী ফলপ্রসূ, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কাজটা বুনিয়াদী শিক্ষায় যেমন কেবলমাত্র শিক্ষার উপলক্ষ্য নয়, চরিত্র গঠনের মাধ্যম, তেমন আর কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় নয়। অন্যান্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় কাজটা গৌণ, কাজটিকে অবলম্বন করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশন করাই মুখ্য। বুনিয়াদী শিক্ষায় 'শিক্ষা' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থে কেবলমাত্র কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ আহরণ করা যথেষ্ট নয়। মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা, দেহে মনে আত্মায় তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার উপাদান প্রাচুর্যে ভরপূর, অথচ দেহমন, আত্মার পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস বিকাশের মাধ্যম হবার উপযুক্ত কাজকেই সেজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিতে হয়। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ কেবল শিক্ষাদানের উপলক্ষ্য নয়, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার যোগ্য মাধ্যম। সকল কাজ এভাবে চরিত্র গঠনের যোগ্য মাধ্যম হতে পারে না ; তাই বুনিয়াদী

বিদ্যালয়েও যে কোন কাজকে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা যায় না।

সর্বপ্রথমে শিক্ষামূলক কাজকে বৃত্তিমূলক কাজ থেকে আলাদা করা প্রয়োজন। সব কাজেই শিখবার মতো কিছু না কিছু থাকে। কাজটিকে যখন যান্ত্রিকভাবে না শিখে বুঝে আয়ত্ত করা যায়, তখনই তাকে শিক্ষামূলক শিল্পকাজ বলা যেতে পারে। যান্ত্রিক কাজে অভ্যাসের উপরই প্রায় সবটুকু জোর দেওয়া হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজটিকে দেখবার চেষ্টা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার পরিমাপ হয় প্রধানতঃ উৎপাদনের পরিমাণ দেখে ; যন্ত্রপাতি ও উপাদান আগে থেকেই ঠিক করে দেওয়া থাকে, সেগুলি নিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনরকম মাথা ঘামাতে হয় না। বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক শিল্পকাজের মধ্যে তফাতটা মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর। একই কাজ বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলকভাবে শেখা যেতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ; যেমন, সূতাকাটার কাজ। ভারতবর্ষে কাটুনীর সংখ্যা কম নয়। রেশম, পশম ও কার্পাসে মিলে অনেক লোক সূতা কেটে মজুরি উপার্জন করেন। বংশপরম্পরায় সূতা কাটার কাজে হাত পাকানোর ফলে এঁদের অনেকেই নিপুণ কারিগর। কিন্তু এঁদের হাতে সূতাকাটার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল বা তৈরী বস্ত্রের বিশেষ কিছুই উন্নতি হচ্ছে না। বংশপরম্পরায় ওঁরা একই যন্ত্র ব্যবহার করছেন, একই পদ্ধতিতে সূতা কেটে চলেছেন। যন্ত্রের ব্যবহার, গঠন, কাঁচামালের উৎকর্ষ অপকর্ষ, পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাববার কথা তাঁদের মনেও হয় না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির, বিভিন্ন পদ্ধতির

আবিষ্কারের ফলে এঁদের শিল্প দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এঁরা অসহায়ভাবে মুমূর্ষু শিল্পকে আঁকড়ে পড়ে আছেন। এ ক্ষেত্রে শিল্পটিকে যান্ত্রিক বলা চলে। যান্ত্রিক শিল্পকাজের প্রধান লক্ষণ হল প্রগতিহীনতা। বদ্ধ জলার মত এরকম কাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং ক্রমে পঙ্কিল হয়ে ওঠে। এখানে অনগ্রসরতার কারণ সম্পর্কে শিল্পী সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন; শিল্পের অবনতি বা অনগ্রসরতার যান্ত্রিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণগুলি আবিষ্কার করে তাকে দূর করতে তিনি অসমর্থ। যান্ত্রিক শিল্পশিক্ষা যে কেবলমাত্র শিল্পের উন্নতির অন্তরায় তা নয়; যান্ত্রিকভাবে কাজ করা, শুধু শিল্পকে নয়, শিল্পীকেও ধ্বংস করে, তাকে যন্ত্রের অঙ্গমাত্রে পরিণত করে, তার মননশক্তিকে স্থাণু করে দেয়। কোন শিল্পযন্ত্র বা শিল্পপদ্ধতিই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। যে শিল্পী দিনের পর দিন শিল্পযন্ত্রগুলির ব্যবহার ও প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে যান, তাঁর চোখে যদি যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলি ধরা না পড়ে, যদি তিনি শিল্প-কাজটিকে পূর্ণতরভাবে আয়ত্ত করার দিকে প্রতিনিয়তই একটু একটু অগ্রসর হতে না থাকেন, যদি তিনি যন্ত্র প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির খুঁতগুলি দূর করার উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে চিন্তা করতে অক্ষম হন, যদি এই চিরাচরিত প্রক্রিয়ার অচলায়তনের মধ্যেই তিনি তুষ্ট হয়ে বসে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে তিনিও তাঁর শিল্পের সঙ্গে ফসিলে পরিণত হয়েছেন। শিল্পকাজ শিল্পীরই ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। যদি সেই প্রতিচ্ছবিতে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র না থাকে, যদি শিল্পীর কাজ ছাঁচে ঢালা কাজের মত নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন হয়, তবে বুঝতে হবে যে, শিল্পীর প্রাণশক্তির অপমৃত্যু ঘটেছে।

শিল্পীর এই মননশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার কাজ। সুতরাং শিক্ষামূলক কাজে প্রতিপদে শিল্পীকে সজাগ থাকতে হয়। শিল্পী যদি (১) কাজের পরিকল্পনা নিজে রচনা করতে পারেন, (২) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযোগ্য সরঞ্জাম নিজে তৈরী, সংগ্রহ ও মেরামত করতে পারেন, (৩) বুদ্ধিযুক্তভাবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন, এবং (৪) নিজের কাজকে যাচাই করবার ক্ষমতা যদি তাঁর থাকে, তবেই তিনি প্রকৃত শিক্ষামূলকভাবে কাজটিকে আয়ত্ত করছেন। শিক্ষামূলক শিল্প কাজের জন্য উপরোক্ত প্রত্যেকটি জিনিস অপরিহার্য বলে আমার ধারণা।

যেখানে শিল্পীকে তার কার্যপরিকল্পনার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে তিনি অন্যের হুকুমের চাকর মাত্র। কাজের ব্যাপক রূপ ও ফলাফল বিচারের শক্তি তাঁর থাকে না। এতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। অনেক সময় তিনি তাঁর অজ্ঞাতসারে শোষণ ও অত্যাচারের যন্ত্রমাত্রে পরিণত হন। আজকালকার কেন্দ্রীভূত সমাজ ও আথিক-ব্যবস্থায় এর সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে। যুদ্ধবিশারদগণ তাঁদের যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করেন। মারণাস্ত্র তৈরী করা সেই পরিকল্পনার একটা অঙ্গমাত্র। যখন বৈজ্ঞানিকরা সেই পরিকল্পনাকে অন্ধভাবে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেন, এর পরিণাম মানবসমাজের উপর কি হবে বিচার করেও দেখেন না, তখন তাঁদের বুদ্ধির একটা সঙ্কীর্ণ পথে বিকাশ লাভ ঘটলেও তাঁদের বলিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির অপমৃত্যু ঘটে।

তেমনই মিলমালিকেরা যখন বস্ত্রের উৎপাদন দিয়ে দেশবিদেশের বাজার দখল করার পরিকল্পনা করেন, যখন অন্য জাতির টুঁটি চেপে তার অর্থনৈতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন, তখন মিলের শ্রমিক উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে নিজের অজ্ঞাতে অন্যকে শোষণ করার যন্ত্রে পরিণত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রচনার উপর জোর খুব কমই দেওয়া হয়ে থাকে, এবং পরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করাকে অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করা হয় না। কতকগুলি বাঁধা-ধরা পাঠ্যপুঁথির মধ্য দিয়ে যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরের মনোমত কতকগুলি উত্তর উদ্গীরণ করাই যেখানে শিক্ষালাভের পরীক্ষা বা পরিমাপ, সেখানে শিক্ষার্থীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু কাজের মাধ্যমে যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানেও দেখেছি যে, এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে একেবারেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। শিক্ষক কতকগুলি পূর্বপরিকল্পিত মডেল অনুযায়ী কাজ করিয়ে যান, তার ফলে শিক্ষার্থী অল্প সময়ে হয়তো অনেকগুলি মডেল তৈরী ক'রে ফেলে, কিন্তু নিজের অভাববোধ ও তার সমাধানের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষা হয় না। দ্রুতগতিতে অনেকখানি কাজ করে ফেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান কথা নয়। শিক্ষকের পরিকল্পনাকে একমাত্র সম্বল করে যেসব বিদ্যার্থী কাজ শেখেন, তাঁরা পরগাছার মত চিরকালের জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে থাকেন। পরিকল্পনা রচনার মধ্য দিয়ে কাজের সমগ্র রূপটি, তার খুঁটিনাটি হিসাব আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শিল্পী তাঁর শিল্পকে কতখানি আয়ত্ত করছেন, তার খুঁটিনাটি নিয়ে কতখানি ভেবেছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

কাজটা যান্ত্রিকভাবে করা না করা অনেকখানি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে। ব্যবহৃত প্রত্যেকটি যন্ত্রের বিজ্ঞান যে শিল্পীর অনায়ত্ত, যিনি যন্ত্র তৈরী বা মেরামত করার ব্যাপারে পরের উপর নির্ভরশীল, তাঁর পক্ষে বুদ্ধিযুক্তভাবে যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয়। যন্ত্রের গঠন-প্রণালী ও তার বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ সুপরিজ্ঞাত থাকলে যন্ত্র তৈরী করা, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে মেরামত করা, একটা যন্ত্র না পাওয়া গেলে অন্য যন্ত্রের সাহায্যে কাজের ক্ষতি না করে কাজটিকে চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। যেসব যন্ত্র তৈরীর কাঁচামাল স্বীয় পারিপার্শ্বিকে পাওয়া যায় না, তা ব্যবহার করার বিপদ আছে, বিশেষতঃ সে যন্ত্র যদি অপরিহার্য হয়। যন্ত্র সম্পর্কে অসহায় পরনির্ভরশীলতা যান্ত্রিক কাজেরই একটি লক্ষণ। সুতরাং শিক্ষামূলকভাবে কাজ করতে গেলে এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়, যে সব যন্ত্রপাতি শিক্ষার্থী নিজেই তৈরী বা মেরামত করতে পারবে, যার কাঁচামাল শিক্ষার্থী নিজের পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই পাবে। কেবলমাত্র আধুনিকতম যন্ত্র ব্যবহার করাই কাজের প্রগতির লক্ষণ নয়। কতখানি কাজ হল, এটাই কাজ সম্পর্কে বড় কথা নয়, কিভাবে কাজটি হল সেটাই প্রধান বিবেচ্য। আমরা এ সম্পর্কে প্রায়ই ভুল করে থাকি। কারণ, আমরা অনেক সময় শিল্পকে শিল্পীর চাইতে বড় করে দেখি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাজের পেছনে যে মননশক্তি রয়েছে, তার উপরই কাজের উৎকর্ষ নির্ভর করে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধুনিক যন্ত্রে সহস্র সহস্র শ্রমিক কাজ করেন। তাঁরা প্রায়শঃ যন্ত্রের একটি বিশেষ অংশের

ব্যবহার শিক্ষা করেন মাত্র। এখানে অন্ধ অভ্যাসই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং শিল্পী হিসাবে তাঁদের অপমৃত্যু ঘটে। আমরা যখন আধুনিক যন্ত্রের বিপুল কর্মক্ষমতাকে প্রগতির লক্ষণ বলে মনে করি, তখন এইসব যন্ত্রব্যবহারিকারীদের কথা ভুলে যাই। যন্ত্রগুলি প্রগতিমূলক চিন্তার ফসল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে প্রগতি হয়েছে মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিকের, লক্ষ লক্ষ যন্ত্রব্যবহারকারীদের নয়। যত বেশী শিল্পীর অনায়ত্ত এমনিতর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, যত বেশীসংখ্যক শিল্পী যান্ত্রিক শ্রমিকে পরিণত হয় মাত্র, ততই বেশী মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। সুতরাং যন্ত্রের আয়তন ও জটিলতা বাড়ার সঙ্গে মানুষের প্রগতি ঘটছে এ কথা বলা শক্ত; কারণ, এর ফলে নিত্যই অধিকতরসংখ্যক মানুষ যান্ত্রিক শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে।

বুদ্ধিযুক্তভাবে কাজ করা শিক্ষামূলক কাজের প্রাণবস্তু। ভাল পরিকল্পনা ও প্রচুর যন্ত্রপাতি থাকলেই যথাযোগ্য কাজ হয় না। কাজের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে উপযুক্ত যন্ত্রটি ব্যবহার ও সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা। কি কারণে কাজের কোথায় কোন্ ত্রুটি বা কোন্ উন্নতি হতে পারে তা জানা না থাকলে এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে যেমন একদিকে নিজের দেহ ও যন্ত্রপাতির উপর অধিকার থাকা দরকার, তেমনই কাজের খুঁটিনাটি হিসাব ও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান প্রয়োজন। তা ছাড়া পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ ভুল ত্রুটি যাতে এড়ান যায়, তার জন্য বিভিন্ন দেশ ও কালে সেই কাজ সম্পর্কে অন্যের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। এই জ্ঞান ছাড়া কাজ অন্ধ হতে বাধ্য।

এতদ্ব্যতীত যে কাজ শেষ করেই শিল্পী কাজটি সম্পর্কে নিরুৎসুক হয়ে পড়েন তাকেও শিক্ষামূলক কাজ বলা চলে না। প্রত্যেকটি কাজ থেকে শিক্ষা নেওয়া শিক্ষামূলক কাজের একটা মস্ত বড় কথা। নিজের কাজকে বারবার যাচাই যিনি না করেন, পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব কাজে সামান্যতম তফাত কেন হল এবং তা দূর করবার উপায় কি, এ সম্পর্কে যে শিল্পী সর্বদা সজাগ নন, তাঁর কাজের প্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তেমন কাজ ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজের মধ্যেই শিক্ষণীয় বস্তু অনেক থাকে এবং প্রত্যেক কাজই যান্ত্রিকভাবে অথবা শিক্ষামূলকভাবে সম্পাদন করা চলে। কিন্তু প্রত্যেক কাজের মধ্যেই শিক্ষার উপাদান সমান থাকে না। যে কাজের মধ্যে শিক্ষার উপাদান সর্বাধিক, অথচ যে কাজ শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আনন্দ উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য এবং তার পক্ষে সহজসাধ্য, তেমন কাজই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া উচিত।

কাজ করতে শিশু সর্বদাই চায়। যে কাজ সে ভালবাসে, যে কাজের প্রয়োজন সে বোধ করে, তার জন্য অনেকখানি শক্তি খরচ করতে তার কোন কার্পণ্য নেই। কিন্তু যে কাজ শিশু বোঝে না, যে কাজ করার কোন প্রয়োজনবোধ শিশুর মধ্যে নেই, যে কাজ করতে গিয়ে তার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় না, আনন্দ আপনি উপচে পড়ে না, সে কাজে শিশু সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি শিক্ষামুলক কাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। সেজন্য কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, যাতে

কাজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা শিক্ষার্থীর মনে অঙ্কুরিত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষার্থীর শারীরিক অথবা মানসিক শক্তির অতীত কোন কাজ তার পক্ষে শিক্ষামূলক হতে পারে না।

কোন কাজের শিক্ষণীয় বস্তুর প্রাচুর্য নির্ভর করে এই সবের উপর :

(১) কাজটির মধ্যে বিচিত্র রকমের উপাদান ব্যবহারের সুযোগ থাকা দরকার। সাধারণভাবে শিল্পকাজের উপাদানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, (ক) যেসব উপাদানকে অতি সহজে বিভিন্ন রূপ দেওয়া যেতে পারে, যথা— কাদা, বালু, তূলা, প্লাস্টিসিন প্রভৃতি। এই উপাদানগুলি ৬।৭ বছরের শিশুরাও অতি সহজে নাড়াচড়া করতে পারে। (খ) যেসব উপাদানকে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, যথা : কার্ডবোর্ড, বাঁশ ইত্যাদি। ৮।৯ বছরের শিশুরা সহজে এই সব উপাদান ব্যবহার করতে পারে। (গ) কঠিন পদার্থ, যথা : কাঠ, পাথর, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি। ১১।১২ বছর বয়স থেকে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ এসব উপাদানের ব্যবহার আয়ত্ত করতে পারে। যে কাজে কেবলমাত্র একই রকমের উপাদান ব্যবহার করা হয়, তা সহজেই একঘেয়ে হয়ে পড়ে। উপাদানের বর্ণবৈচিত্র্য, স্পর্শবৈচিত্র্য, ব্যবহারে বিভিন্ন কলাকৌশল শিশুর পক্ষে একান্ত চিত্তাকর্ষক। সুতরাং একই উপাদান সর্বদা ব্যবহার করলে শিশু কাজটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তা ছাড়া একই রকমের উপাদান বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা

সম্ভব নয়। সুতরাং বয়সের সঙ্গে যদি আমরা শিল্পটিকে বারবার পরিবর্তন করতে না চাই, তবে এমন শিল্প কাজ নির্বাচন করা প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন রকমের উপাদানের ব্যবহার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে শিল্পকে গ্রহণ করা হবে, বারবার তার পরিবর্তনের অসুবিধা খুবই স্পষ্ট। শিল্পকাজকে যেখানে কেবলমাত্র শিল্পকাজ হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, সেখানে নানা শিল্প শেখার মধ্যে আপত্তির কিছু নেই ; কিন্তু শিল্প যেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তু শিল্প-কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে বারবার শিল্প পরিবর্তনে শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি এমন শিল্প নির্বাচন সম্ভব হয়, যাতে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে, তাতে শিক্ষার সঙ্গতি ও পারম্পর্য রক্ষিত হবে।

সাধারণভাবে শিল্পকাজের উপাদানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হলেও প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার বিভিন্নপ্রকার নৈপুণ্যের সৃষ্টি করে। তূলা ও বালি দুটিই কোমল উপাদান ; ৬।৭ বছর বয়সের শিশুরা দুটি উপাদানকেই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু তূলা ব্যবহার করতে আঙ্গুলের যে নৈপুণ্য প্রয়োজন, বালুর বেলায় তার প্রয়োজন নেই। আবার কাদার মত কোমল উপাদান ব্যবহার করতে আঙ্গুলের যে নিপুণতা প্রয়োজন, তূলার ব্যবহারের জন্য নিপুণতার চাইতে তা ভিন্নধর্মী। আবার তূলার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নিপুণতার সঙ্গে কাঠের কাজে অর্জিত নিপুণতা ঠিক সমধর্মী নয়। কাঠের কাজে

ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কাঠের মত কঠিন পদার্থের উপর এরকম ধারালো যন্ত্রের নিপুণ ব্যবহারের জন্য আঙ্গুল ও পেশীর উপর অনেকখানি অধিকার জন্মানো প্রয়োজন; কিন্তু তুলার আঁশ না ছিঁড়ে বা অতিরিক্ত চাপে আঁশগুলিকে সোজা করে না ফেলে তূলা পিঁজতে আঙ্গুলের যে সংবেদনশীলতা প্রয়োজন তা কাঠের কাজের বেলায় নেই। আবার কাঠের কাজ করতে গিয়ে দৈর্ঘ্য, দূরত্ব, মাপজোখ সম্পর্কে চোখের ও আঙ্গুলের যে যে জ্ঞান হতে থাকে তূলার ব্যবহারে তার সুযোগ নেই। সুতরাং একইজাতীয় উপাদানেও উপাদান ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে আমরা বিচিত্র রকমের শিক্ষা লাভ করতে পারি। অতএব শিক্ষা-মূলক শিল্পকাজে উপাদান বৈচিত্র্য যত বেশী থাকে, শিক্ষার দৃষ্টিতে কাজটি ততই মূল্যবান।

উপাদান সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত উপাদান সহজপ্রাপ্য হওয়া প্রয়োজন। সার্বজনীন শিক্ষা ও দুষ্প্রাপ্য শিক্ষোপকরণ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা। দুষ্প্রাপ্য উপাদান ব্যবহার করে সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে হরিজন করে রাখা হয় মাত্র। প্রকৃত শিক্ষা ইন্দ্রিয়ের ও মনের। সামান্য উপাদানকে কেন্দ্র করেও সকল ইন্দ্রিয়ের ও মনের পূর্ণতর বিকাশ সাধন করা সম্ভব। শিক্ষাকে অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা এই সহজ সত্যকে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করে তুলি। শিক্ষার দিক থেকে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ত্রুটি এই যে, এতে আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অনুসন্ধিৎসা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। মূল্যবান শিক্ষোপাদানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে

আমরা আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেলি। নিজেদের সমস্যার সমাধান যে নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই থাকতে পারে, নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস যে নিজের হাতেই নিপুণভাবে গড়া যেতে পারে, এ বিশ্বাস ক্রমশঃ আমাদের মনে ক্ষীণ হয়ে আসে। এরই ফলে আমরা সর্দিকাশি হলেই 'সিরাপ অব বাসক উইথ টলু' কেনার জন্য ডাক্তারের দোকানের দিকে ছুটি ; বাসক-পাতা ও তুলসীপাতা যে আমাদের আঙ্গিনার চারপাশে অযত্নে পড়ে আছে, তার কথা বেমালুম ভুলে যাই ! যা সহজে প্রাপ্য, যা আমাদের চারপাশেই রয়েছে, তাকে ব্যবহার করার শিক্ষা পেলে পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিবিড় যোগস্থাপন, তাকে ভাল করে জানা চেনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।

(২) দ্বিতীয়তঃ কোন শিল্পকাজে শিক্ষার উপাদানপ্রাচুর্যের জন্য একান্ত সরল যন্ত্রপাতি থেকে ক্রমশঃ জটিলতর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ থাকা দরকার। বুদ্ধিযুক্তভাবে কাজ করার জন্য শিল্পীর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা দরকার শিল্পযন্ত্রের ওপর। যন্ত্রবিজ্ঞান যে শিল্পীর অনায়ত্ত, তারপক্ষে যন্ত্রকে বুদ্ধিযুক্তভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং যন্ত্রের মধ্যে ততটুকু জটিলতা থাকাই বাঞ্ছনীয়, যতটুকু ব্যবহারকারীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব। আবার যাতে শিক্ষার্থীর অধিকতর জটিল যন্ত্রের কৌশল আয়ত্ত করার শক্তি ক্রমেই জন্মাতে থাকে, শিক্ষামূলক শিল্পশিক্ষায় তার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। যন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে শিল্পের ক্রমবিকাশও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; সুতরাং জটিলতর যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে

শিক্ষার্থী ক্রমশঃ শিল্পের ক্রমবিকাশ এবং তার সঙ্গে বিজ্ঞান ও সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আসতে পারে। যে শিল্পকাজে বিচিত্র যন্ত্র ব্যবহারের প্রচুর সুযোগ নেই, শিক্ষার দৃষ্টিতে তাই তার মূল্য সামান্য। বুনিয়াদী পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বয়স থাকবে ৬ থেকে ১৪ বৎসর; সুতরাং এইসব তরুণ শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারবে এমন যন্ত্রপাতি এই পর্যায়ে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিচিত্র তৈরী খেলনা অপেক্ষা শিশুরা যেসব জিনিস নিজে তৈরী করতে, ভাঙতে ও মেরামত করতে পারে তাতেই তাদের অধিকতর আগ্রহ, অধিকতর আনন্দ। আমরা অনেক সময় মূল্য দিয়ে জিনিসের বিচার করি। শিশুর কাছে কোন জিনিসের আর্থিক মূল্য তুচ্ছ। খুবই নির্বিকার চিত্তে সে একটা দামী ঘড়িকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করতে বা একটি মূল্যবান ফাউন্টেন পেনকে লোহার পেরেক বলে কল্পনা করে হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। যার মধ্য দিয়ে সে তার সৃজনীশক্তিকে প্রকাশ করতে পারে, যে জিনিসটাকে তার নিজের খুশীমত ভাঙতে বা গড়তে পারে—তারই দাম তার কাছে বেশী। মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে বাধা-নিষেধের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটা দামী জিনিস হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানা-উপদেশ দিয়ে শিশুকে উদ্ব্যস্ত করে তুলি। তাই তেমন জিনিস নিয়ে শিশু সহজ হতে পারে না, তাই তা নিয়ে আনন্দও শিশু বেশী পায় না। সুতরাং মূল্যবান সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি শিশুর হাতে তুলে দিলে তার শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই ব্যাহত হয়। একান্ত সহজ প্রাপ্য জিনিস দিয়ে সরলভাবে তৈরী যন্ত্রপাতিই শিশুর হাতে দেওয়া দরকার।

এক সেট মেকানোর সঙ্গে একটা বাঁশের ও পিসবোর্ডের তৈরী নিক্তিকে তুলনা করলেই আমরা বিষয়টা বুঝতে পারব। মেকানোটি ছেলের হাতে দিয়েই তাকে সাবধান করতে হয়: "স্ক্রুগুলি যেন হারিয়ে ফেলো না। সাবধানে ব্যবহার করো, যেন কোন টুকরো হারিয়ে না যায়।" ইত্যাদি। যন্ত্রটার জন্য এখানে আমরা সম্পূর্ণভাবে পরের ওপর নির্ভরশীল। একটা অংশ হারিয়ে গেলে সেটা নিজেদের তৈরী করে নেবার সুযোগ নেই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এখানে খেলাটা নিছক খেলা নয়, বড়দের কাজের অনুকরণ। এখানে আগাগোড়া শিশুর নিজের অভাব বোধের সঙ্গে কোন যোগ নেই। এখানে যান্ত্রিক কৌশল অনেকখানি আয়ত্ত হতে পারে সন্দেহ নেই, বিবিধ দ্রব্য তৈরী করার আনন্দও এখানে থাকতে পারে; কিন্তু শিশুর সকল আনন্দ এখানে নানাবিধ বাধা-নিষেধের প্রচুরতায় কণ্টকিত হয়ে থাকে। একটা বাঁশকে চেঁচে নিক্তি তৈরী করার উপযোগী করতে কম নিপুণতার প্রয়োজন নয়। কিন্তু এখানে উপাদানগুলির সহজপ্রাপ্যতার জন্য বাধা-নিষেধও কম, আর ভাঙ্গবার গড়বার সুযোগও এখানে বেশী। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যন্ত্রটি তার নিত্য অনুভূত অভাব মেটাবার কাজে সহায়ক। আবার এই সামান্য সরল যন্ত্রটি থেকে আরম্ভ ক'রে জটিলতম পরিমাপক যন্ত্র পর্যন্ত এগিয়ে যাবার একটা স্বাভাবিক পথ রয়েছে।

(:) যে কোন শিল্প-কাজে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য সেই শিল্পের মধ্যে শিক্ষোপকরণের প্রাচুর্যের আর একটি লক্ষণ। যত বেশী ইন্দ্রিয়কে যত বিচিত্র ভাবে কাজে নিয়োজিত করা যায়, সেই কাজ থেকে বহুবিধ শিক্ষা পাবার সুযোগ ততো পাওয়া

যায়। একটা কাজ করতে গিয়ে যদি একটা অঙ্গকেই বিশেষভাবে অনবরত নিয়োজিত করতে হয়, তবে ক্রমশঃ কাজটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং কাজের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ক্রমে একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। এই একঘেয়েমি একটি কাজকে যান্ত্রিক করার সমগ্র কাজটিকে আনন্দহীন ও শিক্ষাবিহীন করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই যে কাজে বিচিত্র প্রক্রিয়া নেই, তা একটা বিশেষ বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত হলেও তাতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছু থাকতে পারে না। ফলে কাজটা কোন কোন ক্ষেত্রে একটা বিশেষ শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার মাধ্যম হবার উপযুক্ত হলেও সমগ্র শিক্ষালয়ের পক্ষে শিক্ষণীয় হতে পারে না। অনেক সময় সূতা কাটাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যোগ্য শিল্পকাজ বলে বলা হয়। কেবলমাত্র সুতা কাটাকেই যদি একটি শিল্প বলে গ্রহণ করা হয়, তবে তা শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে না। সূতা কাটায় কেবলমাত্র দুইটি যন্ত্র, তকলী ও চরকা ব্যবহার করার সুযোগ আছে। এই দুইটি যন্ত্রের প্রাত্যহিক অভ্যাস সহজেই একঘেয়ে হতে পারে। এতদ্ভিন্ন এতে যদি কেবল মাত্র একটি উপাদান তূলা ব্যবহার করা হয়, তাহলে ব্যবহার্য উপাদানেরও কোন বৈচিত্র্য এতে থাকে না। তৃতীয়তঃ কেবল সূতা কেটে শিশুদের কখনও তৃপ্তি হতে পারে না। বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাটা সূতা স্তূপাকার হয়ে জমে থাকে। এর ফলে নিষ্ফল কাজ করে শিশুরা কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেবলমাত্র নিজের কাটা সূতার স্তূপ দেখে শিশু বেশী দিন আনন্দিত হতে পারে না। সুতরাং সূতা কাটাকে সমগ্র বস্ত্রশিল্পরূপে চিন্তা না করে যদি এই সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা

দেওয়া যায়, তবে সূতা কাটা একটা বৈচিত্র্যহীন যান্ত্রিক কাজ হতে বাধ্য এবং তাতে শিক্ষোপকরণ সামান্যই থাকবে।

(৪) কোন একটি শিল্প কাজে শিক্ষণীয় বিষয়ের বস্তুতঃ প্রাচুর্য্য সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে জীবনের সঙ্গে সেই কাজটির ব্যাপক ও গভীর যোগাযোগের ওপর। মানুষের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে তার নিজের জীবনকে উন্নত করতে গিয়ে। যুগে যুগে মানুষের সামনে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব, তার ক্রমবিকাশ নির্ভর করেছে এই সব সমস্যার সমাধানের ওপর। তাই মানুষ তার সকল শক্তি, সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে এই সব সমস্যার সমাধান করার জন্য। এ যাবৎ মোটামুটি ভাবে মানুষ তার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে ; তারই ফলে মানুষের অস্তিত্ব আজও পৃথিবীর বুকে রয়েছে, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও প্রাণহীন নির্জীব নিশ্চল না হয়ে বহুমুখী ধারায় বিভিন্ন দিকে এগিয়ে চলেছে। যে সব জীব নিজেদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, তারা হয় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, নয় বিবর্তনের একটা পর্যায়ে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, সভ্যতা সংস্কৃতিতে আর এগুতে পারেনি। পৃথিবীর বুকে বহু অতিকায় প্রাণী ছিল, আমরা জানি। খাদ্যের প্রশ্ন, নির্মম শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার প্রশ্ন এসে দেখা দিল তাদের সামনে। সেদিন তারা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে নি। তার মূল্য তাদের দিতে হল পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে। অন্যান্য অনেক প্রাণীর সঙ্গে মানুষ সমাধান করল সে সমস্যার। ফলে ক্ষুদ্র নগণ্য পশু—মানুষ—সেদিন আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। পশুর মত দলবদ্ধ

হয়ে আত্মরক্ষার উপায় মানুষ শিখল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আবিষ্কার করে মানুষ অন্য সব পশুকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। ক্ষুদ্র মানুষ শক্তিমান হয়ে উঠল হাতের সঙ্গে মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে। তার চাইতে অধিকতর শক্তিমান জীবকে সে বশ মানালো, কাজ আদায় ক'রে নিলো তাদের কাছ থেকে। মানুষের বিবর্তন শেষ হল না এইখানেই। মানুষ প্রকৃতিকে যত বেশী জানতে লাগল ততই সে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে কাজে লাগাবার উপায় আবিষ্কার করতে লাগল। এর মধ্য দিয়েই উদ্ভাবন হল কৃষির, বস্ত্রশিল্পের, গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের, খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর। মানুষের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, তার মূলে রয়েছে হয় প্রকৃতিকে ভাল করে জানবার প্রচেষ্টা, নয় তার সমাজ-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করবার চেষ্টা। আর এই দুই প্রচেষ্টার গোড়াতে রয়েছে তার জীবনের কতকগুলি মৌখিক সমস্যা। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে খাদ্যের, বস্ত্রের, আশ্রয়ের, স্বাস্থ্যের ও পারস্পরিক যোগাযোগের সমস্যা। মানুষ যেখানে তার এই সমস্যাগুলির যথাযোগ্য সমাধান করতে পেরেছে, সেখানে তার বিবর্ত্তন স্পষ্টতঃ চোখে পড়ে। সেখানে সে আয়ত্ত করেছে অনেক জ্ঞান, তৈরী করেছে অনেক যন্ত্রপাতি, লাভ করেছে প্রচুর সুখ ও শান্তি। যেখানে সমস্যাগুলির সুসমাধান সম্ভব হয় নি, সেখানে হয় চরম দারিদ্র্য, নয় প্রাচুর্য্য এলেও শান্তি আসে নি, ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মঙ্গলের বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেখানেই দেখি মানুষ আবার হিংস্র পশুর মত লোলুপ হয়ে উঠেছে, সেখানেই অমঙ্গলের ঝড়ের আভাস, সেখানেই আত্মকলহের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইঙ্গিত।

সুতরাং মানুষের সমগ্র ধর্ম ও বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, যন্ত্রপাতি, সকল হিসাবপত্র গড়ে উঠেছে এইসব মৌলিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত কাজগুলিকে কেন্দ্র করে। ফলে এই কাজগুলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার ব্যাপকতা যত বেশী হবার সম্ভাবনা, তেমন আর কিছুতে নয়।

যে শিল্পকাজে উপাদান, যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য আছে, যে শিল্পের সঙ্গে মানুষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর যোগ রয়েছে, যে শিল্পকাজ মানুষের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত, যে কাজ শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির অতীত নয়—যাকে শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারে, তা শিক্ষাদানের উপযুক্ত মাধ্যম সন্দেহ নাই। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষা নির্বাচন ব্যাপারে আরো কিছু ভাববার আছে। কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশন করাই বুনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন বুনিয়াদী শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হলেও চরিত্র গঠনই বুনিয়াদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। আমাদের সাধারণ শিক্ষালয়ে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের বিচ্ছেদ ঘটেছে, সত্যের সাধনার সঙ্গে মঙ্গলের সাধনার যোগ নেই। তাই দেখি, পশ্চিম দেশ বিজ্ঞানের সাধনার মধ্য দিয়ে সত্যকে লাভ ক'রে শক্তিমান হয়েছে, কিন্তু পাশব লোলুপতা, মূঢ় শক্তিমদমত্ততা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। লোভ হচ্ছে বিজ্ঞান সাধনার সবচেয়ে বড় রিপু। এই লোভ সাধককে সত্য থেকে ভ্রষ্ট করে, কামনার বস্তুকে সত্য বলে স্বীকার করতে প্রলুব্ধ করে। বিজ্ঞান সাধনার যতটুকু খাঁটি, তা ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করেছে, বিজয়ের বরমাল্য লাভ করেছে ; আর যেখানে তা মূঢ় আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বারা অন্ধ, সেখানে

এসেছে আত্মকলহের আবিলতা, উদ্দাম হিংস্রতার নগ্ন পশুত্ব। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ যে একই সত্তা, একই সত্য, একথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন সত্যের সাধনা মিথ্যার মরীচিকার পেছনে ছোটা, এ উপলব্ধি আমাদের একান্তই ক্ষীণ হয়ে গেছে। এই উপলব্ধিকে জাগ্রত করা বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কাজ কেবলমাত্র শিক্ষাদানের যোগ্য মাধ্যম, তাকে গ্রহণ করলেই চলবে না। যে কাজের দ্বারা আমরা সমাজ সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার ঐক্য উপলব্ধি করতে পারব, সামাজিক সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করতে পারব, যার মধ্য দিয়ে সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলকে প্রত্যেকের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে গ্রহণ করার বোধ আমাদের জন্মাবে, তেমন কাজকেই বুনিয়াদী শিক্ষার যোগ্য মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা চলবে। অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষার যোগ্য মাধ্যম হবে সেই কাজ, যে কাজ কেবলমাত্র মনের নয়, পরন্তু দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষবিষয়ক হবে; অর্থাৎ যে কাজের মধ্য দিয়ে দেহ যথাযোগ্য শক্তি পাবে, বুদ্ধিযুক্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। আত্মিক ব্যাপ্তি দেহের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে জগতকে ভালবাসা দ্বারা আপন করে নেবার শক্তি লাভ করবে। আমরা দেখি যে, আজকের শিক্ষা সমাজের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তির একটা অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ ঘটায়, শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে অবজ্ঞা করতে শিখি মাত্র। এজন্য শিক্ষিত লোককে একটা অবাস্তব স্বপ্নজগৎ তৈরী করে তাতেই সাবধানে বসবাস করতে হয়। পারিপার্শ্বিকের সমস্যা যে আমারই সমস্যা, এই সমস্যার সমাধানের ওপরই যে আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে—এ বোধ আমাদের কিছুমাত্র নেই। তাই

আমরা আমাদের সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত বলে সগৌরবে ঘোষণা করে পাণ্ডিত্যের গর্বে স্ফীত হই। এ কালিমা যে আমাদেরই সর্বাঙ্গে লেপিত হয়, এ কলঙ্ক মুছবার দায়িত্ব যে আমাদেরই, একথা মুহূর্তের জন্যও আমাদের মনে হয় না। সে জন্য আমাদের সমগ্র দেশ যখন খাদ্যের অভাবে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে মৃত্যুর ছায়ায় দিন গোনে, তখন আমরা বিলাসদ্রব্যের গবেষণায় সময় কাটাতে পারি। যখন বস্ত্রের অভাবে সমগ্র দেশ উলঙ্গ, তখন বস্ত্র রপ্তানির অর্থনৈতিক কারণ অন্বেষণের জন্য গবেষণা করতে বসি। ডালের উপর দাঁড়িয়ে ডালটিকেই কাটবার প্রচেষ্টার এই 'কালিদাসী পাণ্ডিত্য' থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের মুক্ত করতে চায়। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য দেশের কর্মের সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে দেওয়া, নিজেদের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের জাগ্রত করে দেওয়া।

এ ছাড়াও বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিল্পনির্ব্বাচনে আরো কতকগুলি বিষয় ভাববার আছে। স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাগত সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য। জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যের জন্যও যারা পরনির্ভরশীল তাদের পক্ষে স্বাধীনতা বা অপরের সঙ্গে সহযোগিতা অর্থহীন। পরনির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরবিরোধী এবং স্বাধীনতা ছাড়া সহযোগিতা অর্থহীন। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এমন কাজ নির্বাচন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী প্রথমাবধি আত্মনির্ভরতার শিক্ষা পায়; সে যাতে আত্মনির্ভরতার মধ্যে আনন্দ পেতে, স্বাবলম্বনকে শ্রদ্ধা করতে এবং স্বাধীনতা রক্ষার আত্মশক্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হতে শেখে! অতএব বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে

এমন কোন কাজ নির্বাচন করা উচিত নয়, যাতে শক্তি ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে বাধ্য, যে কাজ সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীভূত ব্যবহার প্রয়োজন।

কতকগুলি কাজকে আমরা হেয় বা হীন বলে মার্কা মেরে রেখেছি। এমন কাজ—যথা, রান্নাবাড়া, বাসনমাজা, মেথর-মুচি-তাঁতী-কুমার-কামার প্রভৃতির কাজ—আমরা পারতপক্ষে করতে চাই না। ফলে যাদের আমরা বুদ্ধির জোরে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য চাপ দিয়ে এ সমস্ত কাজ করতে বাধ্য করতে পারি, তাদের ঘাড়ে এ সকল কাজকে দিয়ে ফলভোগ করতে চাই। এর থেকেই শ্রেণী-সংগ্রামের জন্ম, এরই মধ্যে যুদ্ধের বীজ নিহিত। মার্ক্সবাদ মনে করে যে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে বিত্তহীনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই এই সংগ্রামের শেষ হবে; পৃথিবীতে নূতন শান্তি এবং সমৃদ্ধির যুগ আসবে। গান্ধীজী তা মনে করেন না। তাঁর মতে, প্রত্যেকের মধ্যেই এই পরোপজীবী প্রকৃতির বীজ রয়েছে। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐশ্বর্য লোভকে প্রশমিত করতে পারে না। কাজ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীই আমাদের লোলুপতার কারণ। কঠোর শাসন-ব্যবস্থা দিয়ে সাময়িকভাবে লোভের বহিঃপ্রকাশকে চাপা দেওয়া যেতে পারে সত্য, পর শোষণের প্রবৃত্তিকে ঐশ্বর্য উৎপাদনের নেশায় হয়ত সাময়িকভাবে রূপান্তরিত করা যেতে পারে; কিন্তু তাতে মূল প্রকৃতিটা আরো বেশী ক'রে ইন্ধন পায় মাত্র, রূপান্তরিত হয় না; এবং ফলে আবার বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল ভোগলিপ্সার উদ্দাম জোয়ারকেই ডেকে আনে। যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে আগুন কেবলই প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, নির্বাপিত

হয় না, তেমনি ভোগকে তার উপকরণ জুগিয়ে দিলে ভোগ-প্রবৃত্তিও কেবলমাত্র অধিক হতে অধিকতর উদ্দাম হয়ে উঠতে থাকে, প্রশমিত হয় না। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অথচ তথাকথিত হীন কাজ করার সুযোগ যাতে প্রত্যেক বিদ্যার্থী পায়, এ কাজগুলি যে শিক্ষামূলক ভাবে আনন্দের সঙ্গে করা যেতে পারে, এ জ্ঞান যাতে তাদের হয়, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

অসাম্য প্রকৃতির রীতি। সকলের মধ্যে সব গুণ সব শক্তি সমান থাকে না। সুতরাং, জোর করে সাম্য স্থাপন কথাটা মুখরোচক হলেও বাস্তব নয়। সমাজ যেমন জটিল, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি যেখানে সাধারণের অনায়ত্ত, শক্তি যেখানে কেন্দ্রীভূত, সেখানে বুদ্ধিমানের একাধিপত্য অপরিহার্য। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রে জনগণের স্বাধীনতা ও সাম্যের ধ্বজা ওড়ানর ভান করা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। অসাম্যকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষ স্বমর্যাদায় শান্তিতে বাস করতে পারে যখন, তখনি সমাজ ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নয়। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী যন্ত্র ব্যবহার করা, পরের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ থাকলেও আত্মসংযমের শিক্ষার দ্বারা তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকা। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার এবং আত্মসংযমের শিক্ষা দুইটি প্রধান শিক্ষা।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, সমগ্র জীবনের সকল কাজকেই শিক্ষামূলকভাবে এবং বিকেন্দ্রিত অহিংস সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী করে শিক্ষা দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি মাত্র কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করতে হবে, এ ধারণাটা একান্তই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিধি বিদ্যালয়-গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং কোন একটা বিশেষ কাজও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম নয়। শিক্ষার্থীর উঠাবসা, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি প্রতিটি অভ্যাস, দাঁতমাজা, পাইখানা করা, খাওয়া, অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা প্রভৃতি প্রতিটি কাজ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করবার শিক্ষা দেওয়া বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি কাজকে আট বছর সময়ের মধ্যে নিখুঁত ও শিল্পমূলকভাবে করবার শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এমন কতকগুলি কাজ বেছে নেওয়া দরকার, যার মধ্যে শিক্ষার উপাদান প্রচুর রয়েছে এবং অহিংস সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষেও যে কাজগুলি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

এমন কাজের একটি ন্যূনতম তালিকা গড়তে গেলেও দেখতে পাই যে, (১) মানুষকে একটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাস ও কাজ করতে হয়। সুতরাং ভালভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে না জেনে কোন কাজই যথোপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে জানবার ও তাকে উন্নত করার জন্য যে সকল কাজ করা দরকার, তা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য্য। (২) দ্বিতীয়তঃ জীবনের জন্য অপরিহার্য্য কাজগুলি করবার শক্তির অভাবেই আমাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হয় এবং এই কাজগুলিকে হীন মনে করার মধ্য দিয়েই সমাজে ভেদ, শোষণ ও হিংসার জন্ম হয়। খাদ্য, বস্ত্র, আবাস

ও পরিচ্ছন্নতা আমাদের জীবনের জন্য একান্তই অপরিহার্য্য। আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজের প্রেরণা জোগায় এই অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলির সুপ্রচুর উপার্জন করার প্রবৃত্তি। কিন্তু এই অপরিহার্য্য বস্তুগুলি উৎপাদন করার কাজকে হয় আমরা হেয় বলে মনে করে যথাসম্ভব নিজেরা না করে অপরকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাই অথবা বৃহত্তর ও মহত্তর কাজের দোহাই দিয়ে এই কাজগুলি কেন্দ্রীভূত উৎপাদক-ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে ফেলি। এই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন, অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা, শোষণ এবং নিরঙ্কুশ শাসন সম্ভব হয়। দেশব্যাপী পরিকল্পনা যতই বাড়ছে, ততই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুষ্টিমেয় শাসকের ইঙ্গিতে সমগ্র দেশবাসী চলতে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার হাতে জীবনের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যের উৎপাদনের সকল ব্যবস্থার ভার তুলে দেওয়া নিজেদের জীবন-মরণের চাবি কাঠিটি অন্যের হাতে তুলে দেওয়ারই নামান্তর। এতে স্বাধীনতাকে বলি দিয়ে অলসতাকে লাভ করতে হয়। অপর পক্ষে আমাদের মত শিল্পে অনগ্রসর দেশে যখন আমরা এই কাজগুলিকে হেয় মনে করে মজুরকে দিয়ে করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি, তখন অপরের শক্তি ও বুদ্ধির অল্পতার সুযোগ গ্রহণ করে তাকে শোষণ করার, চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার প্রবৃত্তির জন্ম হয়। যারা একাজ করে, তারাও এসকল কাজ করার বিশেষ যোগ্যতা ও প্রবণতা আছে বলে যে তা করে তা নয়। যারা অসহায়, যাদের অন্য কোন কাজ শেখার বা করার কোন সুযোগ নেই, তারাই এ সকল কাজ করে থাকে। ফলে সমাজের বহুপ্রকার ক্ষতি হয়, প্রথমতঃ যারা এ সকল কাজ করে তারা নিতন্তই বাধ্য হয়ে করে বলে তাদের কাজে

কোনপ্রকার আগ্রহ থাকে না। তাই তাদের হাতে কাজের কোন প্রকার উন্নতিই হয় না। এজন্যই আমরা এ সকল ক্ষেত্রে কাজের কোন প্রগতি দেখি না। দ্বিতীয়তঃ, যারা এ সকল কাজ করে, তাদের শিক্ষার কোন সুযোগ থাকে না বলে তাদের মধ্যে যারা সমাজের সেবা অন্য উপায়ে আরো ভাল করে করতে পারত, তারা নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশের কোন সুযোগ পায় না। তৃতীয়তঃ, সমাজের চোখে হীন কাজ করতে বাধ্য হয় বলে এদের নৈতিক পতন ঘটে এবং এদের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, যার ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। চতুর্থতঃ, এই কাজগুলিকে হেয় মনে করে আমরা এ সকল কাজকে কম মূল্য দিতে থাকি। ফলে জীবনের জন্য অপরিহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের অভাব ঘটে এবং সেজন্য সমাজে এ সকল দ্রব্য সম্পর্কে ক্রমাগত সঙ্কট ঘটতে থাকে। সমাজের এই ভেদ, অসাম্য ও সংঘর্ষের কারণগুলি দূর করা এবং স্বাধীন স্বাবলম্বী সমাজ গড়ে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য, বস্ত্র ও আসন সম্পর্কিত কাজ শেখানোর ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা কর্তব্য। অবশ্য এ সকল পারিপার্শ্বিকের উপযুক্ত করে করার শিক্ষা দিতে হবে, অন্ধভাবে তথাকথিত প্রগতিমূলক সভ্যতার অনুকরণ করলে চলবে না।

(৩) তৃতীয়তঃ যে কোন কাজ শিখতে গেলে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মনের আনন্দ। মানুষের মনকে প্রয়োজন দিয়ে ভরে রাখা যায় না। মানুষের শরীরটা সাড়ে তিন হাত; কিন্তু সাড়ে তিনহাত স্থানে তার চলে না; তার স্বাস্থ্যের জন্য খোলা জায়গা অনেকখানি দরকার। তেমনি মানুষের প্রয়োজন সামান্য, কিন্তু সেই প্রয়োজন

মিটলেই তার মানসিক স্বাস্থ্য মিটলো না; সেজন্য অনেকখানি আনন্দের আয়োজন প্রয়োজন। কাজের মধ্যেই মানুষ আনন্দ পাবে, এটা আদর্শ সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথমাবধিই তা হয় না। সেজন্য শিশুকে কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকখানি নিছক আনন্দের খোরাক থাকা দরকার।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তাই চার প্রকার কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন :— (১) জীবনের জন্য অপরিহার্য্য শিল্পকাজ, (২) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (৩) সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত কাজ এবং (৪) শিশুর প্রক্ষোভকে মুক্তি দেবার মত কাজ।

সঙ্গের প্রদীপন থেকে এই কাজগুলির ব্যাপকতার আভাস পাওয়া যাবে :

[প্রদীপনটি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রদীপনটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য্য কাজের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। আট বছর সময় এবং শিক্ষার্থীর ১৪ বছর বয়সের মধ্যে এর চেয়ে বেশী কাজ হাতে নিয়ে সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা। এর মানে এই নয় যে, স্থানীয় অবস্থা অনুসারে অন্য কোন শিল্প হাতে নেওয়া চলবে না। কিন্তু কোন স্থানীয় শিল্প হাতে নেবার আগে তা শিক্ষা দেবার যোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা এবং তাতে শিক্ষার্থীর ওপর অত্যধিক চাপ পড়বে কিনা, সেটা ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। মুচির গ্রাম হলেই পাদুকাশিল্প অথবা মাদুর বোনা স্থানীয় শিল্প হলেই সেই শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে, এ মত আমি পোষণ করি না। কামারের ছেলে আজ বাধ্য

বুনিয়াদী বিত্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে করণীয় অপরিহার্য্য কাজ

জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য শিল্পকাজ

খাত্তশিল্প

১। জমি তৈরী করা
২। ফসল তৈরী
৩। ফসল কাটা ও গুদামজাত করা
৪। তরিতরকারী কাটা ও রান্নার জন্য চাউল ইত্যাদি পরিষ্কার করা।
৫। রান্না করা
৬। পরিবেশন
৭। ভোজন
৮। পরিচ্ছন্নতা বিধান
৯। খাত্ত সম্পর্কিত জিনিসপত্র তৈরী ও মেরামত করা

বস্ত্র শিল্প

১। কার্পাস উৎপাদন
২। ফসল চয়ন ও গুদামজাত করা
৩। ওটাই
৪। ধুনাই ও পাঁজ করা
৫। সূতা কাটা
৬। বুনবার প্রস্তুতি
৭। কাপড় বোনা
৮। কাপড় রাঙান ও ছাপান
৯। সেলাই ও রিপুর কাজ
১০। যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত করা

গৃহনির্ম্মাণ শিল্প

১। আবাস নির্ম্মাণের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ।
২। গৃহ মেরামতের কাজ।
৩। গৃহ নির্ম্মাণ।
৪। যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত করা।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত কাজ

- প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ
- ঋতুউৎসব
- সংগ্রহাগার সংগঠন
- প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যদিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কিত কাজ

- ভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ
- সামাজিক কাজ
  - ১। শুশ্রূষা
  - ২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা বিধান
  - ৩। স্বেচ্ছাসেবকের কাজ
  - ৪। লোকশিক্ষার কাজ
  - ৫। পূজা পার্বণ উৎসব ইত্যাদির উন্নততর ব্যবস্থা করা
- বিত্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা

মনোরঞ্জক কাজ

১। নাচগান
২। খেলাধূলা
৩। সঙ্গীত
৪। চিত্রাঙ্কন
৫। অভিনয় ও হাস্য কৌতু

হয়েই কামার হয়, মেথরের ছেলে বাধ্য হয়েই মেথর হয়; আবার উকীল-ডাক্তারের ছেলেরাও বাধ্য হয়েই ওকালতী কিংবা ডাক্তারী পড়ে। আমাদের দেশে বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল "গুণকর্ম বিভাগশঃ"; তাতে মানুষের যোগ্যতাটাই ছিল বড় কথা। আজ যোগ্যতা বা প্রবণতা সত্যি সত্যি পরীক্ষা করার কোন উপায়ই নেই, কারণ সকল কাজ করার সুযোগ প্রথম জীবনে শিশুরা কোথাও পায় না। প্রাথমিক শিক্ষার স্বাবলম্বনের আদর্শের মধ্য দিয়ে শিশু সকল কাজ করার সুযোগ পাবে এবং ভবিষ্যৎ সমাজ গুণ ও কর্মের যোগ্যতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ। সমাজ-বিপ্লবের এই গোড়ার জিনিসটা বাদ দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কোন অর্থ হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজনৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাতে শিশুকে একটি কারিগরে পরিণত করাই উদ্দেশ্য নয়। শিশু যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে কাজ করতে শেখে, সে যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে শিল্প কাজ করায় নিপুণ হয়ে ওঠে, তবে কোন স্থানীয় শিল্প সে অল্প আয়াসেই আয়ত্ত করে নিতে পারবে। সেজন্য গৃহ-পরিবেশই যথেষ্ট বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু সে যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে নানারকম উপাদান ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নিয়ে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করতে শেখে এবং উত্তর বুনিয়াদী পর্যায়ে তার যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

তাছাড়া প্রাথমিক স্তরে দেশের সকল শিশু একটা সাধারণ ঐতিহ্যের অধিকারী হবে, এটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে তাতে স্থানীয়

কারণে বিভিন্ন স্থানে খানিকটা বৈশিষ্ট্য থাকলেও শিক্ষাটা মূলতঃ একই হওয়া প্রয়োজন। মূল শিল্প বিভিন্ন স্থানে সম্পূর্ণ আলাদা হলে এই উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার জন্যই কোন কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয় না; কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থাৎ এখানে কাজের গুরুত্বই সমধিক। সুতরাং কাজের সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তুও বিভিন্ন হতে বাধ্য। অতএব যদি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়বস্তু অনেকখানি বিভিন্ন হয়ে পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি বস্ত্রশিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয় তবে স্থানীয় কারণে রেশম, পশম, অথবা কার্পাসের কাজ শেখা যেতে পারে কিন্তু মূল সমস্যাটি এক হওয়ায় শিক্ষার বিষয়বস্তুর বিশেষ তারতম্য ঘটবে না। তেমনি যন্ত্রপাত তৈরী করার জন্য স্থানীয় অবস্থা বিশেষে বাঁশ অথবা কাঠকে গ্রহণ করা চলতে পারে। কিন্তু যে কোন উপাদানকে অবলম্বন করে মূলতঃ একই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশন করা চলবে। কিন্তু যদি কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ কিংবা কার্পাস থেকে সূতা কাটাকে মূল শিল্পের আসন দেওয়া হয় তবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অনেকখানি সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য রক্ষা করতে গেলে পাঠদান কষ্টকল্পিত হয়। শিক্ষার্থীরা যখন কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য শিক্ষা লাভ করে, তখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর এই বিভিন্নতা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় হলেও প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে এই অনৈক্য ক্ষতিকর বলে আমার মনে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মূল শিল্প হিসাবে-কাঠের কাজ, সূতাকাটা, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত শিল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান থাকলেও এরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মূল শিল্প হতে পারে না বলেই আমার ধারণা, একমাত্র শিল্প তো নয়ই। কোন একটি কাজের মাধ্যমে কেবলমাত্র শিক্ষাদান করাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হলে, এ সকল কাজ কেন, যে কোন শিল্প কাজকে কেন্দ্র করে প্রচুর শিক্ষাদান করা সম্ভব হত না। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প নির্বাচনে শিক্ষানৈতিক প্রয়োজন ব্যতীত একটি সমাজনৈতিক প্রশ্নও আছে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা শোষণহীন বিকেন্দ্রিত সমাজের স্বাবলম্বী নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। এই স্বাবলম্বনের অর্থ যে আর্থিক স্বাবলম্বন নয়, অর্থকরী শিক্ষা নয়, একথা অন্যত্র আলোচনা করেছি।* শোষণহীন সমাজে স্বাবলম্বনের অর্থ হচ্ছে জীবনের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যগুলিকে নিজের হাতে উৎপাদন করার যোগ্যতা এবং আনন্দের সঙ্গে ও পূর্ণ আত্মমর্যাদার সঙ্গে এ সব কাজ করার শিক্ষা। উপরোক্ত যে কোন একটি শিল্প শিখে এই যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়। ১৪ বৎসর বয়সে প্রত্যেক শিশু নিজের প্রয়োজনীয় একান্ত অপরিহার্য জিনিসগুলি উৎপাদন করার শক্তি অর্জন করবে এবং সমাজের প্রতি তার কর্তব্য নিপুণতা ও আনন্দের সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারবে, এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। এজন্য সমগ্র খাদ্যশিল্প, বস্ত্রশিল্প, আবাস নির্মাণের কাজ, পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ ইত্যাদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এই সঙ্গে শিক্ষা-

* "বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রয়োজনে উপরোক্ত কাজগুলির মাধ্যমে বই বাঁধান, বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরী, চারুশিল্প প্রভৃতি কতকগুলি শিল্পকাজ অপরিহার্য ভাবেই শিখতে হবে।

কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প, কাটুনীর কাজ প্রভৃতি যে কোন একটি বিশেষ শিল্প শিখে উপরোক্ত শিক্ষানৈতিক ও সমাজ-নৈতিক উভয়বিধ আদর্শকে সার্থক করা সম্ভব নয়। শিক্ষানৈতিক দিক থেকে শিক্ষণীয় কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। এই বিকাশের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ও বিচিত্র যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া মন ও আত্মার বিকাশের সুযোগের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সার্বজনীন ও সর্বকালীন সমস্যা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। উপরোক্ত কাজগুলির কোনটিই এককভাবে এদিক থেকে পরিপূর্ণ সুযোগ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করতে পারে না। এসব কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেও যথা-যোগ্য পরিচয় ঘটা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, আবাস ও পরিচ্ছন্নতা বিধান সর্বদেশের ও সর্বকালীন সমস্যা। এ সকল সমস্যার সমাধানের বাস্তব প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শিশু সমগ্র মানব সমাজ, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এই কাজগুলি করতে গেলে শিক্ষার্থী বিচিত্র উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত হবে। বস্তুতঃপক্ষে কার্পাস, রেশম, বাঁশ, কাঠ, ধাতু, মাটি, চামড়া প্রভৃতি উপাদান এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কাঠ, কার্পাস, চামড়া প্রভৃতি আমাদের মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত করে না; এগুলি মানুষের

মৌলিক সমস্যা সমাধানের এক একটি উপাদানমাত্র। এজন্য এসব শিল্পের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা হয় সঙ্কীর্ণ, নয় কষ্টকল্পিত হতে বাধ্য। বিশেষজ্ঞ হবার জন্য প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা ও প্রবণতার পরীক্ষার ভিত্তিতে উচ্চ বুনিয়াদী ও উত্তর বুনিয়াদী পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে এগুলিকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশেষজ্ঞ হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ; সুতরাং সেই স্তরে এই শিল্পগুলিকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ করা চলতে পারে না। অপর পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র, আবাস নির্মাণ ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ করতে গেলে এসকল শিল্প আপনা আপনিই আসে এবং এই বয়সের উপযোগী করে বৈজ্ঞানিকভাবে বিভিন্ন শিল্প শিক্ষাদানের সুযোগ যথেষ্টই ঘটে। খাদ্যের ব্যাপারে মাটি, বাঁশ, কাঠ, ধাতু ইত্যাদি শিল্প আনুষঙ্গিকভাবে আপনিই এসে পড়ে। বস্ত্রের জন্যও তেমনি এসকল উপাদান প্রয়োজন ; আবাসের জন্যও তাই। স্বাবলম্বী ভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস নির্মাণের কাজ করতে গেলে শিশুকে মৃৎশিল্প, বাঁশ, কাঠ ও সূতার কাজ আবশ্যিকভাবেই শিখতে হবে। সুতরাং শিশুকে কোন রকম বিশেষ কারিগরে পরিণত করা যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য না হয়, তবে এসকল শিল্পকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ না করে খাদ্য, বস্ত্র, আবাস নির্মাণের মত ব্যাপক শিল্পকে বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকেও এই বিষয়টি খুব জরুরী। সব রকম কাজ করার সুযোগ না দিয়ে অল্প বয়সে বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার মধ্যেই সামাজিক অসাম্য বিদ্যমান। শিশুর যোগ্যতা ও প্রবণতা প্রমাণিত হবার আগেই

যেখানে সমাজ তাকে কোন একটা কাজে বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে চায়, সেখানে বাইরের চাপটাই প্রধান, এটা সহজে বোঝা যায়। হয় এখানে পিতামাতার অসহায় অবস্থার জন্য শিশুকে একটা বিশেষ কাজ একান্ত বাল্যকালেই বেছে নিতে হয়, নয় পিতামাতার সামাজিক অর্থবল ও মর্যাদার ফলে অযোগ্য হলেও সমাজের চোখে মর্যাদাপূর্ণ কোন একটা কাজ করার সুযোগ শিশুকে দেওয়া হয়। অহিংস সমাজের যোগ্য নাগরিক হতে হলে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার আগে শিশুকে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাজেই সক্রিয় অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এখানে তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে শিশুর খেয়াল ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে এবং পিতামাতার আব্দারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু যে কাজ শিখবে তা ছুতোরমিস্ত্রী, মৃৎশিল্পী, লৌহকার, কাটুনী কিংবা অন্য কোন পেশাদার হবার জন্য নয়; সৎমানুষ হবার জন্য, পরকে শোষণ করে পরগাছার মত বা পরের তাঁবেদার ভৃত্য হয়ে যাতে না থাকতে হয় তারই জন্য। সুতরাং, কোন একটা বিশেষ শিল্পকে ধরে আট বছর শিক্ষাদান করার কোন অর্থই হয় না। অনেক সময় বস্ত্রশিল্পকে যথাক্রমে সূতাকাটা কিংবা কৃষি বলে অভিহিত করা হয় এবং কি করে এরকম একটিমাত্র শিল্পের মাধ্যমে বুনিয়াদী পর্য্যায়ে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উপরোল্লিখিত প্রদীপন থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, বস্ত্র বা খাদ্য শিল্পকে সূতাকাটা, কৃষি, কাঠের কাজ ইত্যাদি শিল্প কাজের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা সমীচীন হবে না।

বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকেও বস্ত্র, খাদ্য, আবাস নির্মাণ, পরিচ্ছন্নতা বিধান ইত্যাদি কাজের সঙ্গে কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদির তফাৎ অনেকখানি। বস্ত্র, খাদ্য, ইত্যাদি মানুষের চিরকালের সমস্যা বলে এর সমাধানের জন্য একান্ত সরল ও সহজ-প্রাপ্য যন্ত্রপাতি ও উপাদান থেকে আরম্ভ করে একান্ত দুষ্প্রাপ্য ও জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলে। কিন্তু প্রাথমিক পর্য্যায়ের জন্য সমগ্র সমস্যাটিকে উপস্থাপিত করতে গেলেও একান্ত সরল ও সহজ-প্রাপ্য জিনিষপত্র দিয়েই কাজ চালান যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বস্ত্রশিল্পের কাজ আরম্ভ করতে একটি বাঁশ কাটার অস্ত্র, কয়েক টুকরা বাঁশ ও খানিকটা মাটিই যথেষ্ট। বাঁশ এবং মাটি দিয়ে সূতা কাটার জন্য তকলী তৈরী করা যেতে পারে। ডিমের খোলার মত সহজপ্রাপ্য জিনিস দিয়ে দপ্তীর কাজ চালান চলে, একখানি খুরপীর সাহায্যেই জমি থেকে কার্পাস উৎপাদন করা চলে, বাঁশের ধনুক দিয়েই তূলা ধোনা যায়, বাঁশ এবং তকলীতে কাটা সূতা দিয়ে তাঁত করা যায়। প্রয়োজনীয় ভাণ্ডগুলি মাটি দিয়ে করে নেওয়া যায়। সুতরাং সমগ্র বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বাঁশ, মাটি ও সামান্য কয়েকটি যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ এই সামান্য কয়েকটি উপকরণের সাহায্যে শিশু মানব-সভ্যতার আদিকাল থেকে আজকার বস্ত্র-সমস্যা পর্য্যন্ত সবটুকু বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। জটিলতর যান্ত্রিক-গঠন ও প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এরই মারফৎ পরিচিত হওয়া চলে। বাঁশ দিয়েই কল্যাণমান, নিক্তি, চরখা, জটিলতর তাঁত ইত্যাদি তৈরী করা চলে। খয়ের প্রভৃতি সহজপ্রাপ্য উপকরণ দিয়ে কাপড় রাঙানর

রাসায়নিক প্রক্রিয়া শেখবার কাজ আরম্ভ করা যায়। যখন কাঠের এবং লোহার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় তখনও সমগ্র শ্রেণীর জন্য এরকম যন্ত্রপাতি কয়েক প্রস্থ থাকলেই চলে। ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিখবার মত প্রচুর উপাদান এরই মধ্যে পাওয়া যাবে। আবার বস্ত্রশিল্পে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য আধুনিকতম বিজ্ঞানের অবদান পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে ব্যবহার করার সুযোগও এর মধ্যে আছে। বস্ত্রশিল্প মানে কার্পাস শিল্প নয়। খাদি কার্পাসের, পশমের, রেশমের বা রেয়নের—সব কিছুরই হতে পারে। যেহেতু এর কোন না কোন উপকরণ সর্বত্র প্রাপ্য এবং যেহেতু কাপড়ের ব্যবহার সার্বজনীন, সেজন্য আমরা সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই শিল্পের প্রবর্ত্তন করতে পারি এবং এর মধ্য দিয়ে এই পর্য্যায়ের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারি। এই একই কারণে খাদ্যশিল্প, গৃহনির্মাণ শিল্প, পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ প্রাথমিক পর্য্যায়ে সর্বত্র গৃহীত হতে পারে। খাদ্যের ব্যবস্থা অনেক স্থানে বিদ্যালয়ে করা সম্ভব নয় বলে খাদ্যশিল্পের সবগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্ভব নয় বলে বলা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সীমা বিদ্যালয়-গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাকে তাদের গৃহের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। খাদ্য বিষয়ক অনেক শিক্ষা শিশুর গৃহ পরিবেশের মধ্যেই দিতে হবে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের বাগানে এমন কাঁচা শাকসব্জী উৎপাদন করতে হবে যা শিশুর খাদ্যবিষয়ক অপূর্ণতার পরিপূরক। এই কাঁচা শাকসব্জী বিদ্যালয়ে কোটা, পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা, পরিবেশন করা ও ভোজন করা চলবে। এতদ্ব্যতীত ভ্রমণ ও বন-ভোজন

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এবং খাদ্য সম্পর্কেও সমস্যার বহু সমাধান এই কাজগুলির মধ্য দিয়েও হবে। খাদ্যের ব্যাপারেও আমরা একান্ত সরল থেকে একান্ত জটিল প্রক্রিয়া শেখার এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারি। গৃহনির্মাণ ব্যাপারেও সামান্য বাঁশ খড় মাটি থেকে আরম্ভ করে আমরা একান্ত জটিল উপকরণ ব্যবহার করতে পারি। প্রক্রিয়ার দিক থেকেও সামান্য সাহায্য করার কাজ থেকে খুব জটিল কাজ করান চলে। আবার এই সমস্যাগুলি মানুষের চিরকালের সমস্যা বলে মানুষের প্রগতির সবটুকু আখ্যানই এর মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা চলবে।

অপর পক্ষে কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি কাজ মানুষ স্নুরু করেছে অনেক পরে। সমাজের অনেকখানি জটিলতর অবস্থায় এই শিল্পগুলির প্রবর্ত্তন হয়েছে বলে এর ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং মহার্ঘ। শিক্ষামূলকভাবে শিল্পকাজ করতে গেলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি থাকা দরকার; কারণ, যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে রাখা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা শিক্ষামূলক শিল্পকাজের একটি প্রধান অঙ্গ। কাপড়, খাদ্য বা গৃহ-নির্মাণের ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে, নিত্য-ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতিগুলি স্থানীয় উপকরণে অতি সহজে তৈরী করে নেওয়া চলে। কিন্তু কাঠের কাজের মত শিল্পে তা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, তা ব্যয়সাপেক্ষ। স্থানীয় উপকরণে, স্থানীয় ব্যবস্থায় বর্তমান অবস্থায় তা তৈরী করাও সম্ভব নয়। কাঠের কাজকে শিক্ষামূলক শিল্প হিসাবে গ্রহণ করতে হলে

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অন্ততঃ ৩০০৲ টাকার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে। তাছাড়া ভাল কাঠের গুদাম, বিভিন্ন রকম কাঠ মজুত করার ব্যবস্থার প্রশ্নও আছে। কাঠ এমন জিনিস নয় যে, উপাদানটি সহজে ও অল্প সময়ে তৈরী করা চলবে। প্রত্যহ কাঠের কাজের মারফতে শিক্ষা দিতে হলে যে পরিমাণ কাঠ প্রয়োজন হবে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়। চামড়ার কাজের বেলাতেও একথা প্রযোজ্য। অথচ এই ধরণের কাজগুলিতে জটিলতর শিক্ষার উপাদান প্রচুর থাকলেও ব্যাপক প্রাথমিক উপাদান অল্প।

অতএব প্রয়োজন, সম্ভাব্যতা ও যোগ্যতা—সবদিক থেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রাথমিক স্তরে খাদ্য-শিল্প, বস্ত্র-শিল্প, গৃহনির্মাণ-শিল্প, পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ ও সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত কাজ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উচ্চ বুনিয়াদী পর্য্যায়ে ৫ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশু যে-কোন একটি শিল্পকে প্রধান শিল্প হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই পর্য্যায়ে মূল শিল্প ছাড়া অন্যান্য কাজে তাকে আংশিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। উত্তর বুনিয়াদী পর্য্যায়ে বিশেষ কোন একটি কাজ শেখার ওপর অনেকখানি জোর দিতে পারা গেলেও অন্ন, বস্ত্র এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য খানিক শ্রম প্রত্যহ দিতে পারা অহিংস সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে আমার ধারণা।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজ সম্পর্কে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। মূল শিল্পগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হলেও এবং এগুলির মধ্য দিয়ে অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পরিবেশিত হলেও অন্য কাজগুলির কথা ভুলে গেলে

চলবে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের লক্ষ্য সমগ্র জীবনকে গড়ে তোলা। উপরোক্ত শিল্পগুলি শেখার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনেকখানি সময় দেওয়া হলেও অন্য কাজগুলির গুরুত্ব কম নয় এবং তাদের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি ছোটখাট শিল্পকাজ শেখা হবে। অনেক সময়েই এই কাজগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় না; আর তারই ফলে জনসাধারণের মনে একটা ধারণা হয়েছে যে, কেবলমাত্র একটি মূলশিল্পের অবলম্বন করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয়। পরিচ্ছন্নতার জন্য ঝাঁটা দরকার। স্থানীয় পরিবেশ থেকে উপযুক্ত উপকরণ বেছে নিয়ে তা তৈরী করতে শিখতে হবে। হিসাবপত্র রাখা, দিনলিপি লিখা, বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজের বিবরণ রাখা ইত্যাদি নানা কাজের জন্য খাতা দরকার। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ্য-পুঁথি থাকবে না বলে এ সকল খাতার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সমধিক। এজন্য খাতা তৈরী করা, খাতা বাঁধান, লেবেল কাটা ও আঁটা শিখতে হবে। প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ, সংগ্রহাগার, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদির জন্য এলবাম তৈরী করা শেখা দরকার। সংগ্রহাগারের জন্য কার্ডবোর্ডের নানা আকৃতির পাত্র প্রয়োজন হবে। উৎসব, অভিনয় ইত্যাদির জন্য স্থান তৈরী করা, গৃহ-সজ্জা, ষ্টেজ বাঁধা, গেট করা প্রভৃতি কাজ শিখতে হবে। বিদ্যালয়ে বসবার জন্য স্থানীয় উপকরণে আসন তৈরী করা, জিনিসপত্র রাখার জন্য এ রকম উপকরণে বিভিন্ন রকমের ও আকৃতির পাত্র তৈরী করা প্রয়োজন হবে। এর মধ্য দিয়ে বাঁশ, বেত, তালপাতা, খেজুর পাতা প্রভৃতি উপকরণের কোন না কোনটা সম্পর্কিত শিল্পকাজ নিশ্চয়ই শেখা হবে। এ সকল কাজই শিক্ষামূলকভাবে শেখাতে

হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে পরিকল্পনা থাকবে এবং সে সকল পরিকল্পনা অনুসারে যথাযোগ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করতে হবে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বহু শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। তবে শিল্পগুলি কতগুলি বিচ্ছিন্ন শিল্পকাজমাত্র হবে না। জীবনের প্রয়োজনে এই কাজগুলি করা হবে। এই সব বিচিত্র শিল্পকাজের মধ্যে জীবনকে একটা আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার ঐক্যসূত্র থাকবে। এই জীবনের তাগিদেই শিল্পকাজগুলি হাতে নেওয়া হবে, কেবলমাত্র কতগুলি শিল্পকাজ শেখার জন্য নয়। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী স্বাবলম্বনের যোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে।

এতগুলি শিল্পকাজ শিক্ষক নিজে আনবেন, তাও অধিকাংশ সময়ে সম্ভব হবে না। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় গ্রাম্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জিনিষ নয়। শিক্ষক বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষাদাতা নন। গ্রামের সহযোগিতায় শিক্ষককে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক সঙ্গীত না জানলেও সঙ্গীত শেখাবেন, বাঁশ ও বেতের কাজ না জানলেও তা শেখাবেন, তা সম্ভব নয়। সেখানে গ্রাম্য শিল্পীর কাছে তাঁকে যেতে হবে, শিক্ষাদানের কাজে তাঁর সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ীতে শিশুর দায়িত্ব পিতামাতার। এর মানে এই নয় যে, তাঁরা শিশুকে সব সময় আঁচলের আড়ালে নিয়ে বসে থাকবেন। তেমনি শিক্ষাদানের দায়িত্ব শিক্ষকের। এর অর্থ এই নয় যে, সবখানি শিক্ষাদানের কাজ শিক্ষক একা করবেন। শিশুর কোন্ শিক্ষার প্রয়োজন তা দেখার

এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁর। শিক্ষাদান ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তির ওপর ভার দিতে হবে—ব্যবস্থা করার ভার শিক্ষকের। অনেক সময় মনে করা হয়ে থাকে যে, একজন শিক্ষক একাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটা শ্রেণীতে শিক্ষা দেবেন। তাহলে তাঁকে সর্বজ্ঞ হতে হয়, এ কখনও সম্ভব নয়। এই কথাটুকু মনে রাখলে আমরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিবিধ কাজ শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে একটা অহেতুক সমস্যা থেকে রক্ষা পাব।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন

বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যত বাদানুবাদ হয়েছে, এতো বোধ হয় আর কোন বিষয়কে নিয়েই হয়নি।

গান্ধীজীর মতে স্বাবলম্বনই হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার কষ্ঠিপাথর— 'The acid test of its reality.' গান্ধীজী কেন শিক্ষার পক্ষে আপাতঃদৃষ্টিতে একান্ত অপ্রয়োজনীয় একটি সর্তের ওপর এত জোর দিলেন, তা শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। শিক্ষাবিদেরা এতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করেছেন। তাঁরা জোর করে বলেছেন যে, এতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই ক্ষতি হবে। কিন্তু গান্ধীজী এ বিষয়ে তাঁর স্বমতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ছিলেন এবং দিনের পর দিন শিক্ষায় স্বাবলম্বন সম্পর্কে তাঁর মত দৃঢ়তর হয়েছে। স্বাবলম্বনের সমালোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে গিয়ে শিক্ষকেরা শিশুদের দৈহিক শ্রমের ওপর অতিরিক্ত জোর দেবেন, ফলে নিরানন্দ শিশুরা কাজ করে যাবে শিক্ষকের জীবিকা অর্জনের জন্য ক্রীতদাসের মত, আর শিক্ষকেরা নিষ্ঠুর দাসচালকে পরিণত হবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, শিশুবয়স থেকেই এই কেনাবেচার আর্থিক দিকটা শিশুদের সামনে তুলে ধরলে তা তাদের মানসিক সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। গান্ধীজী এ সমস্ত সমালোচনা ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন এবং যথাসম্ভব তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেছেন যে, এতে বিদ্যার্থী বা শিক্ষক কারো কোনো ক্ষতি হবে না এবং স্বাবলম্বনের পরীক্ষা শিক্ষার উৎকর্ষের একটি যথার্থ মাপকাঠি হবে।

সুতরাং গান্ধীজী যে বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলেছেন, তাকে রূপায়িত করতে হলে স্বাবলম্বনকে একটি গৌণ বিষয় বলে ভাবলে চলবে না। এই মাপকাঠিকে মনে রেখে, এই মাপকাঠি দিয়ে নিজের কাজের বিচার করে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীকে এগুতে হবে। ডাঃ জাকির হোসেনের ভাষায় বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে একটা 'essentially good education' যার 'incidentally' স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা রয়েছে।* গান্ধীজীর কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে স্বাবলম্বন 'incidental' নয়, 'essential'. যে শিক্ষাকর্মী গান্ধীজীর চিন্তা ও কর্মধারার অনুসরণ করতে চান, তাঁর পক্ষে শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্য বুদ্ধিযুক্তভাবে বোঝা প্রয়োজন, নইলে অন্ধ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নিয়ে হয়ত বেশী দূর এগুনো সম্ভব নয়।

শিক্ষাবিদের কাছে শিক্ষা, বিজ্ঞানীর কাছে তাঁর বিষয়বস্তুর মত। বিজ্ঞানী বিশ্বের চলমান প্রাণস্রোত থেকে পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তাকে বিশ্লেষণ করেন, পরীক্ষা করেন, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ করতে গিয়ে তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান যে, তাঁদের পরীক্ষার বিষয়বস্তু সজীব বিষয়বস্তুর সবটুকু নয়, একটা আংশিক ধারণা মাত্র। চোখের ওপর আলোর ক্রিয়ার রূপ ফুটে ওঠে, কিন্তু চোখের ভেতরকার কোষগুলির ওপর আলোক-

* জাকির সাহেবের উপরোক্ত মতের সুস্পষ্ট পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনিও গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, উৎপাদনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা হবে তাই হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর স্বাবলম্বনই হবে সে শিক্ষার সার্থকতার কষ্টিপাথর।

তরঙ্গের নাচনের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের বা ওই রূপের সঙ্গে জড়ান ভয়, ঘৃণা, আনন্দ প্রভৃতি অনুভূতির কোন হদিস মেলে না। রূপের অর্দ্ধেক বস্তু, অর্দ্ধেক তাকে জড়িয়ে যে বিভিন্ন অনুভূতি তা। বিচ্ছিন্ন পদার্থের এই সীমারেখার মধ্যেই বিজ্ঞানের রাজ্য, এর ভেতরই তার সার্থকতা। এ সীমাকে লঙ্ঘন করে যখন বিজ্ঞানের সীমারেখার মধ্যেই আমরা সবটুকু সত্যকে দাবী করি, তখনই বিজ্ঞানকে স্বধর্মচ্যুত করা হয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—বায়ুহীন ক্ষেত্রে একটা পালক আর একটা পয়সাকে উপর থেকে ফেলে দিলে তারা একসঙ্গে এসে মাটিতে ঠেকবে। এ সূত্র সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষাগারের বাইরে এ রকম ক্ষেত্র জগতে নেই, তাই পালক আর পয়সাও কখনও শূন্য থেকে ছেড়ে দিলে একসঙ্গে এসে মাটিতে ঠেকে না। সূত্রের সীমাটা হারিয়ে ফেল্লেই তার যাথার্থ নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি শিক্ষাবিদের কাছে শিক্ষাটাই প্রধান হলেও জীবনে তা সত্য নয়। শিক্ষা লক্ষ্য নয়—পথ, সাধ্য নয়—সাধন। মানুষের মনুষ্যত্ব রয়েছে তার মধ্যের পতনকে জয় করার মধ্যে, এই মনুষ্যত্ব অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। সমষ্টির মঙ্গলের সঙ্গে ব্যক্তির মঙ্গল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সমগ্রের মঙ্গলে অংশের মঙ্গল, মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা বিশ্বচেতনারই অঙ্গ। এমনিতর মূল সত্যকে বুঝবার জন্য যা দরকার, তা শিক্ষা নয়—উপলব্ধি, সিদ্ধান্ত নয়—জ্ঞান। বোধ, প্রেম, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে মানুষ কামনা করে, শ্রদ্ধা করে, প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় শিক্ষার ফলে নয়; তার ভেতরকার সমগ্র চেতনা, মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত হয়ে দাবী করে বলে। মানুষের এই চেতনা তার বুদ্ধিবৃত্তির চাইতে

অনেক ব্যাপক। বস্তুতঃ শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা এই মূল সত্যগুলির উপলব্ধি বা প্রতিষ্ঠা আমরা করতে পারি না। এজন্য শিক্ষার কাজ এই মূল সত্যগুলিকে আবিষ্কার করা নয়, এই সত্যগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় উদ্ভাবন করা, বিদ্যার্থীকে প্রস্তুত করা এই সত্যগুলিকে ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গান্ধীজীর স্বাবলম্বনের ওপর এত জোর দেবার কারণ আমরা বুঝতে পারব। গান্ধীজীর সামনে আদর্শ ছিল বিকেন্দ্রিত স্বাবলম্বী অহিংস সাম্যবাদী সমাজ। সুতরাং শিক্ষার মধ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটি গুণের স্ফূর্তি হওয়া প্রয়োজন, এর প্রত্যেকটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই হিসাবে স্বাবলম্বনের শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বনের অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন হ'লেও বাস্তব প্রয়োগে এর স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিধাহীন হতে পারিনি। দুইটি প্রশ্নকে অবলম্বন করে আমার মনে দ্বিধার দোলা রয়েছে। প্রশ্ন দুটি এই: (১) প্রথমতঃ বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে কি শিক্ষাকর্মীর পক্ষে গোড়া থেকেই স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে তা কি ভাবে সম্ভব; আর যদি অসম্ভব হয় তবে বর্তমান অবস্থাকে জয় করে কিভাবে আদর্শে পৌঁছান যেতে পারে? (২) দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষায় 'স্বাবলম্বন' বলতে ঠিক কি বুঝবো? এখানে স্বাবলম্বন বলতে কি কোন শিশুর উপার্জিত অর্থে শিক্ষকের ভাতের সংস্থান বুঝবো, না এর চাইতে অন্য কোন ব্যাপকতর অর্থে 'স্বাবলম্বন' কথাটিকে গ্রহণ করতে হবে?

এ পর্যন্ত আমি এ প্রশ্ন দুইটি সম্পর্কে কোন শেষ মীমাংসায় এসে পৌঁছুতে পারিনি। কিন্তু এ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে, স্বাবলম্বন কথাটার অর্থ যত সহজ করে অনেক সময় ভাবা হয়ে থাকে কথাটা তত সরল নয়। মনে হয়েছে গান্ধীজী কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক পুরানো নিত্য ব্যবহার্য শব্দের মত এই শব্দটিও এর সাধারণ অর্থের চাইতে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে কাজ করতে হলে আমাদের এই ব্যাপক অর্থের উপলব্ধি থাকা দরকার। রাম নাম, চরখা, অহিংসা প্রভৃতি অনেক শব্দই গান্ধীজী এ রকম ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। গান্ধীজী যখন নিজেকে সনাতন-পন্থী বা হিন্দু বলতেন, তখন আমাদের চলতি অর্থে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতেন না, তিনি যখন রাম নাম স্মরণ করতেন তখন দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই মাত্র স্মরণ করতেন না। সাধারণ শব্দকে তিনি ব্যবহার করতেন, সাধারণ মনকে সে শব্দগুলি সহজে স্পর্শ করবে বলে; কিন্তু তিনি আশা করতেন যে, যাঁরা তাঁর পথ অনুসরণ করে চলবেন তাঁরা শব্দগুলির ব্যাপকতর আদর্শগত অর্থ উপলব্ধি করবেন এবং জনসাধারণের মনে সেই অর্থ ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবেন। আমরা যদি তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলিকে কেবলমাত্র আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করি, তবে আমরা ভুল করবো বলেই আমার ধারণা। সত্যদর্শী ঋষিদের বেদোক্ত সূত্রগুলির অপঅর্থ ও অপপ্রয়োগ করেই একদিন কর্মকাণ্ডপ্রধান ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়েছিল। উপনিষদের আধ্যাত্মিকতাকে পরিত্যাগ করে অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মণের অনুসরণ করতে গিয়েই একদিন আমরা আমাদের ধর্মকে সঙ্কীর্ণ ও অশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিলাম। আজ

আবার হিংসা-বিধ্বস্ত লোভসিক্ত জগতের সামনে নূতন আশার, নূতন সত্যের বাণী নিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ ভারতের এসেছে। এ সুযোগ আমাদের এনে দিয়েছেন গান্ধীজী, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার প্রয়োগের উপায় আবিষ্কার করে। বুনিয়াদী শিক্ষা সেই প্রয়োগ শেখার, সেই অস্ত্রধারণে অধিকারী হবার শিক্ষা। সুতরাং এখানে যদি আমরা অন্ধভাবে কতকগুলি শব্দকে আঁকড়ে ধরে গান্ধীজীর শিক্ষার প্রাণবস্তুকে উপেক্ষা করি, তবে এই চরম সঙ্কটের মুহূর্তে বিশ্বকে সেবা করার দায়িত্বকে আমরা উপেক্ষা করব। কোন কিছু সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় না হয়ে সে সম্পর্কে একটা মত প্রকাশ করা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা। কিন্তু আমি সেই ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করছি না দুটো কারণে : (১) প্রথমতঃ, বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব ; (২) দ্বিতীয়তঃ, আশা করছি যে, এসম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা একবার সুরু হলে অনেক প্রশ্ন সম্পর্কেই হয়ত আলোকপাত হবে এবং আমার মত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের নির্জ্ঞান মনের চিন্তাধারার ত্রুটিও ধরা পড়বে।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিকেন্দ্রিত স্বাবলম্বী অহিংস সাম্যবাদী সমাজ। সে সমাজে পারস্পরিক বন্ধন প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হবে না, হবে প্রেমের বন্ধন। ভালবাসা মানুষকে উদ্বোধিত করবে নিজের কর্তব্য করতে। ভালবাসা মানুষকে উদ্বোধিত করবে নিজের কর্তব্য করতে। ভালবাসা মানুষকে প্ররোচিত করবে পরস্পরকে সেবা করতে, বাইরের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ তাকে কর্তব্য করতে বাধ্য অথবা কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে প্রলুব্ধ করবে না। এমন সমাজ গড়ে তুলতে হলে

এমন মানুষ প্রথমেই গড়ে তোলা দরকার, যারা সর্বাবস্থায় সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে। সেবা ও প্রেমের শিক্ষা যাদের জীবনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে, যারা স্বভাবতই ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু অন্যকে হত্যা করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে না। এক কথায় যাদের সকল কর্মপ্রেরণার উৎস হবে অন্তরের নির্বাত নিষ্কম্প সত্যের আলোক, বাইরের বহুবিধ প্রভাব নয়। আর বাইরের সকল চাপকে প্রতিরোধ করে অন্তরের সত্যকে অনুসরণ করার শক্তি জন্মাবে শুধু তখনই যখন মানুষ হবে স্বাবলম্বী, সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা হবে স্বেচ্ছাকৃত, ব্যক্তিগত অসহায় পরনির্ভরশীলতা-জনিত বাধ্যতামূলক নয়। তখনই মানুষ বিলাসের চাইতে স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকার করতে শিখবে, যখন নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য কাজ নিজের সামর্থ্যেই মানুষ আনন্দের সঙ্গে করে নিতে পারবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এমন সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শিক্ষাকে বাইরের সর্ববিধ চাপ থেকে আত্মরক্ষা করে স্বীয় লক্ষ্য-পথে এগিয়ে চলতে হবে। শিক্ষাকর্মীকে কি তবে একক পথ চলতে হবে ?

কর্মী কাজ করতে গেলে যে যে উৎস থেকে সাহায্য পেতে পারেন, তা হচ্ছে এই : (১) রাষ্ট্র, (২) ব্যক্তি, (৩) গ্রামসমাজ, (৪) গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠান। বর্তমান অবস্থায় এই উৎসগুলির সাহায্য নেওয়া যতখানি সমীচীন তা পর্যায়ক্রমে বিচার করা যাক।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা গান্ধীজীর অনুরক্ত ভক্ত। তাঁদের স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ,

নিঃস্বার্থপরতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং শিক্ষাকর্মীর পক্ষে রাষ্ট্রের সাহায্যে আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আর একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে আমাদের ভুল সহজেই ধরা পড়বে। রাষ্ট্রের সহায়তার ফলাফলের বিচার রাষ্ট্র-পরিচালকদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ দিয়ে করলে চলবে না, একে বিচার করতে হবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি দিয়ে। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শক্তির প্রতীক। এই রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চান যাঁরা, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ না পাল্টে যাঁরা এই রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁদের ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, সজ্ঞানে হোক্ অজ্ঞানে হোক্, শক্তি ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থাকেই পাকা-পোক্ত ক'রে গড়ে তুলতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্র যদি আজ বিকেন্দ্রীকরণের প্রাণবস্তু বুনিয়াদী শিক্ষাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তবে বুঝতে হবে, হয় রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় বর্তমান ব্যবস্থার মৃত্যুদণ্ডের দলিলে স্বাক্ষর করছে, নয়তো বুঝতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীদের অজ্ঞাতসারে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বধর্মচ্যুত করার ব্যবস্থা করছে। এখানে আর একটি কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র অর্থ উৎপাদন করে না। রাষ্ট্রের অর্থ জনসাধারণেরই অর্থ। সুতরাং জনসাধারণ যদি বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের কাছ থেকেই শিক্ষাকর্মী প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থার নামে বহু অর্থ রাষ্ট্রের ছোট-বড়-মাঝারী বহুবিধ কর্মচারীর হাতে তুলে দিয়ে প্রকৃত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ভাণ্ডারকে ক্ষীণ করতে হয় না। আর যদি জনসাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ্রহণ না করে, তবে বর্তমান প্রকৃতির রাষ্ট্রও তাকে

আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রটার প্রকৃতিই এমন যে, মুষ্টিমেয় সংস্কারক এর মধ্যে থেকে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না ; একে পরিবর্তন করতে গেলে সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন ; আর সে সম্ভাবনা আবার জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র যখন বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তখন তাঁর বিচার করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, তিনি এই সাহায্য গ্রহণ করেও নিজের আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারবেন কিংবা বিপরীত আদর্শে বিশ্বাস-সম্পন্ন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নিতে গিয়ে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়বেন।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত সাহায্যের কথা। আজ অর্থ যাঁদের হাতে, তাঁরা বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী নন। বস্তুতঃ সঞ্চিত অর্থ মানেই হচ্ছে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার অসঙ্গত মুনাফা। মুনাফা সুপ্রচুর হয়ে অর্থের পাহাড় কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না, যদি না বৃহৎ যন্ত্র, কেন্দ্রীভূত শক্তি ও প্রচেষ্টা দ্বারা শ্রমিককে শোষণ করা না হয়। সুতরাং ধনবানের আর্থিক সাহায্য যদি গঠন-কর্মের পক্ষে অপরিহার্য হয়, তবে অসহায় ভাবে ধনিকের কবলিত হওয়া ছাড়া গঠন-কর্মীর কোন উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব ও সর্তমুক্ত হওয়া কঠিন, ফলে আদর্শচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধনিকের কাছে হাত পাততে হলে শোষণের ব্যবস্থাতেও হাত মেলাবার সম্ভাবনা দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ধনিকের সর্তহীন দানও কাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। ধনীর ধনের সার্থক প্রয়োগের বিচার তাঁর কাছে টাকা-আনা-পাইএর হিসাবের ওপর। সুতরাং

দানের সার্থকতার বিচার কাজের পরিমাণ দিয়ে করা এই শ্রেণীর দাতাদের পক্ষে স্বাভাবিক। একটি লোকের জীবনের পরিবর্তন, একটা সমাজের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের আভাস যে পৃথিবীর সকল অর্থ দিয়েও পরিমাপ করা যায় না, একথাটা অর্থবানেরা প্রায়ই ভুলে যান। ফলে কর্মীর আত্মমর্যাদা, মানসিক শান্তি ব্যাহত হয় ও পরিণামে কাজের দিকে তাঁর যথেষ্ট মনোযোগ থাকে না, সর্বোপরি ধনিকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ও আদর্শের সঙ্গে গঠনকর্মীর লক্ষ্য ও পথের কোন যোগসূত্র না থাকায় শ্রদ্ধার দানও প্রায়শঃ ভিক্ষার রূপ গ্রহণ করে। মারাত্মক প্রভাব কাজের অগ্রগতিকে অযথা সমস্যা-সঙ্কুল করে তোলে। সুতরাং ধনীর কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ করার আগেও শিক্ষাকর্মীকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, গ্রামসমাজের সাহায্যের প্রশ্ন। স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ গড়ে তোলাই কর্মীর লক্ষ্য। যদি গ্রামসমাজ গোড়াতেই কর্মীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তবে বুঝতে হবে সমাজ সেখানে লক্ষ্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে আছে, সমবায়ের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রিত গ্রামসমাজ কি করে গড়ে তুলতে হবে, তার অনেকখানি উপলব্ধি সেখানে রয়েছে। এ যদি ঘটে, তবে তা আশার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবে এ রকম ক্ষেত্র কয়টি আছে তা বলা শক্ত। বস্তুতঃ এরকম ক্ষেত্র পাওয়ার আশা কর্মীর করা উচিত নয়, এ রকম ক্ষেত্র গড়ে তোলাই কর্মীর লক্ষ্য।

সর্বশেষে আমরা আলোচনা করব গঠনকর্মী ও গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য নেবার কথা। স্বভাবতই মনে হয় যে,

চারা গাছকে প্রথম যেমন ঘিরে রাখার প্রয়োজন আছে, তেমনি কর্মীকেও গোড়ার দিকে অর্থ-মানের ওপর নির্ভরশীল সমাজ থেকে রক্ষা করে ভবিষ্যৎ কাজের জন্য যোগ্য ও শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজীর নামে বিকেন্দ্রিত নূতন সমাজ গড়ে তোলার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের কাছেই এ বিষয়ে প্রাথমিক সাহায্য পাওয়া যাবে এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানেও হতাশ হবার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে হয়। গান্ধীজীর গঠনকর্মের মূল সুর হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ। গঠনকর্মীর আদর্শ হবে নিজের সাধ্য অনুসারে সত্যপথ অনুসরণ করে চলা, আর সর্বশক্তি দিয়ে বিনা সর্তে অন্যের সেবা করা। সুতরাং গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই কাজের উপযুক্ত হতে হলে ক্ষমতার কেন্দ্র না হয়ে সেবার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠতে হয়, কিন্তু সর্বত্রই গঠনকর্মের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বিপরীত আদর্শের প্রভাব নিয়ে। সেখানে অর্থ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এমন কি সেবার আদর্শ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থানে রক্ষিত হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। সেদিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লোক-সেবকদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে, দয়ার মনোভাব নিয়ে, নিজেকে জনসাধারণ থেকে অনেক উঁচু মনে করে সেবার ক্ষেত্রে নামার চাইতে সেবার ভাণ না করাও বরং ভাল। এ উক্তি নিশ্চয়ই তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। রঙ্গমঞ্চে একজন অভিনেতা বলে তিনি হয়ত দেখতে পাননি যে, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও নেতাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হামবড়া ভাবের বিষ সঞ্চারিত হয়েছে। জনসাধারণের দানের অর্থে গঠন-কর্মের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তারপর কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, সেই

অর্থের সাহায্যে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ; প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব কায়েম রাখার ব্যবস্থা করতে, আপন আপন রাজনৈতিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে। আমার বিশ্বাস, এইখানেই গঠনকর্ম আজ স্বধর্মচ্যুত হচ্ছে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে গঠনকর্মের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাই বোধ হয় গঠনকর্মের সার্থক হয়ে ওঠার পথে একটি প্রধান বাধা, কারণ, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বার্থহীন সেবার মূল আদর্শের নামে এঁরা কাজ করে যান, অথচ এঁদের প্রকৃত কাজ এই দুটি আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এঁদের কাছেই সেবার ক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু নূতন কর্মীরা দীক্ষা নেয় ; এঁদের তারা অনুসরণ করে ; ফলে এই বিষ গঠনকর্মের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের অসাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখে জনসাধারণও সত্য ও অহিংসার শক্তি এবং সার্থকতা সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে ওঠে, বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা ও কুটির শিল্পের ভিত্তিতে গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে সুরু করে। নেতাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আদর্শের বিপরীত কাজে গঠন-কর্মীরা যেভাবে জড়িত হয়ে পড়ছেন ; হিংসা ও পশুশক্তির প্রয়োগ, কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ও রাজনীতির কাজে গঠনকর্মে বিশ্বাসী নেতারা যে ভাবে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োগ করছেন, তাতে গঠন কর্মের বর্তমান কর্মপন্থাকে আজ আবার নূতন করে বিচার করার সময় এসেছে। বর্তমান কর্মধারা যদি ভুল হয়, তবে একে পরিবর্তন করে নূতন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বর্তমান গঠনকর্ম-প্রতিষ্ঠান নামীয় ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির সাহায্য গ্রহণ করা কতখানি

সমীচীন হবে, তাও সেবার ক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু কর্মীকে ভেবে দেখতে হবে।

অথচ বুনিয়াদী শিক্ষা যদি সত্য, অহিংসা, স্বাবলম্বন ও সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভাবী সমাজের মস্তিষ্করূপে কাজ করার দাবী করে, তবে কি ভাবে শক্তিকেন্দ্রিক রাষ্ট্র, শোষণ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ধনা এবং ক্ষমতা-লোলুপ নেতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এড়িয়ে ঐ ভাবী সমাজের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব, এও তাকেই আবিষ্কার করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বনের ওপর জোর দেবার এটা নিশ্চয়ই একটি প্রধান কারণ। যদি বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ না হতে পারে, যদি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে উপরোক্ত প্রভাবগুলির কাছে আত্মবিক্রয় করতে হয়, তবে বর্তমান সমাজের কাঠামো বদলে নূতন সমাজ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে কি শিক্ষাকর্মীর একক পথ চলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই? অনেক নিষ্ঠাবান কর্মী এই বিশ্বাস নিয়েই একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এই একক কর্মপ্রচেষ্টার ফলাফল কি হতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার। পাষাণ প্রাচীরের বিরুদ্ধে মাথা ঠোকায় বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু কাজের সম্পাদনার দিক থেকে তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা যে সামাজিক ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছি তাতে কোন কর্মীর এ-রকম একক প্রচেষ্টায় সার্থক হওয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সাধারণ সূত্র নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রথমতঃ, গ্রামকে সেবা করতে গেলে যে-সকল কাজের শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, তা আজকালকার ব্যবস্থায় কারুর

পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন শিল্পকর্মের দ্বারা স্বহস্তে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে সেবার কাজ করার মত সময় ও শিক্ষা সংগ্রহ করা বর্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক নয়। তৃতীয়তঃ, গ্রামসমাজের বর্তমান সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতার মধ্যে দীর্ঘকাল মুক্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রেখে চলমান জগৎ সম্পর্কে সজাগ ও সক্রিয় থেকে জীবন যাপন করা অসম্ভব বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। চতুর্থতঃ, কর্মী যদি নিজেই ধনবান না হন, তবে কাজের প্রাথমিক ব্যবস্থা ও নিজের শিক্ষার উপায় করাও সম্ভব নয়। সুতরাং যিনি একক প্রচেষ্টায় গ্রামসেবার কাজে ব্রতী হতে পারবেন এবং নিজের কাজকে সার্থক করে তুলতে পারবেন, তেমন লোক থাকা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক, নিতান্তই নিয়মের ব্যতিক্রম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্যতিক্রম দিয়ে জাতীয় জীবনের ভিত্তি নূতন করে গড়ে তোলা যায় না। যে মালমশলা আমাদের সমাজে রয়েছে, তাই দিয়েই নূতন ইমারৎ গড়ার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে।

প্রথমেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলে গ্রামসমাজে এই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা চলবে না বলে আমার ধারণা। বুনিয়াদী শিক্ষা আজকালকার প্রচলিত শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বহুদিন দেখার ফলে গ্রামবাসীরা আজকালকার স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা বলে মনে করেন। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থারূপে গ্রহণ করতে গ্রামবাসীরা প্রথমে সম্মত হন না। অতএব গ্রামের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন এবং গ্রামবাসীর অভাব-বোধ ও শক্তিসম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করার আগে এই বিদ্যালয়

খোলা অর্থহীন। বিদ্যালয় সংগঠনের আগে গ্রামে শিক্ষাকর্মীকে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি,* এখানে মুখ্যতঃ স্বাবলম্বনের দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষাকর্মীকে গ্রামে গিয়ে যে কাজের মধ্য দিয়েই গ্রামের সেবা করতে হোক না কেন, সেজন্য তাঁর পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। গ্রাম আজ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে পঙ্গু, সেখানে জীবনের স্রোত আজ রুদ্ধ। কোন্ কারণে গ্রামের প্রগতি আজ আটকে আছে, তার সন্ধান কর্মীকে নিতে হবে, রুদ্ধ স্রোতকে আবার গতিশীল করে তোলার জন্য তাঁকে পথ আবিষ্কার ও তৈরী করতে হবে। এজন্য যে শিল্পদক্ষতা ও বিষয়-জ্ঞান প্রয়োজন, তা বহুব্যাপক এবং দীর্ঘকাল শিক্ষা-সাপেক্ষ। কিন্তু বিদ্যা আজকাল বিক্রয় হয়। ধনহীনই আজ বিদ্যাজগতে শূদ্র, জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ তাদের নেই। আজও পর্যন্ত আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারিনি, যেখানে ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকলে বিদ্যার্থী নিজের শ্রমের পরিবর্তে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। সুতরাং শিক্ষার ব্যবস্থা নিজের একক প্রচেষ্টায় কি করে করা সম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ, গ্রাম-সেবার কাজে সার্থক প্রচেষ্টা করতে গেলে যে সকল বিষয় আয়ত্ত করা প্রয়োজন, তা একজনের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। গ্রামে পুরুষ ও নারী উভয়ের সেবা করতে হবে। আজকার সামাজিক অবস্থায় কোন পুরুষ বা কোন নারীর পক্ষে সমগ্র সমাজকে সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গলের মত অপরিহার্য কাজ নারীর পক্ষেই করা সম্ভব, স্বাভাবিক ও

* 'বুনিয়াদা বিদ্যালয়ের সংগঠন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সমীচীন, আবার ছুতার কিংবা লোহারের মত শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষেরই প্রয়োজন। সুতরাং প্রাথমিক সেবার ক্ষেত্রে মানুষের সাধ্যের সীমার বিচার করলেও দেখা যাবে যে, সমগ্র গ্রাম-সেবার কাজে একাধিক লোকের প্রয়োজন রয়েছে এবং যে হেতু বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমগ্র গ্রাম-সেবারই কেন্দ্র, সেখানেও এই প্রয়োজন অপরিহার্য।

তৃতীয়তঃ, গ্রামের বর্তমান পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সমধর্মী সহকর্মীর প্রয়োজন আছে। কর্মীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা বর্তমানে যথেষ্ট সচেতন নই। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের অভাব কাজের সার্থকতার পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হতে পারে, মনোবিজ্ঞান আজ সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছে। অনেক সময়েই এরকম একক কর্মীর মানসিক অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ না করলেও কাজের প্রচুর ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং এদিক থেকেও একক কর্মপ্রচেষ্টা খুব যুক্তিযুক্ত নয়।

চতুর্থতঃ, বিদ্যালয় আরম্ভের প্রাথমিক ব্যয় কোথা থেকে আসবে? বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী পুঁথিপত্র সরঞ্জাম প্রথম ৬।৭ বছর বিদ্যালয়-পরিচালনার ব্যয় তো বড় কম নয়! নিজের দৈহিক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে গ্রামের সেবা করার মত সময় ও শক্তি-সম্পন্ন লোক একান্ত বিরল হলেও হয়ত পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু নিজের উপার্জনে সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করতে পারেন, এমন লোক পাওয়া অসম্ভব, একথা বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা চলে। কুটির-শিল্প ও জীবনের পক্ষে অপরিহার্য কাজগুলিকে ত্যাগ করে মানুষের বিলাসের ইন্ধন জোগাবার মত কাজ হাতে

নিলে কিংবা কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে হাত মি- অসম্ভব নয় কিন্তু আদর্শ-বিরোধী কাজ করা প্রশ্নের বাই- সে সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। একক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ- ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা, নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের সংস্থান ও বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক ব্যয় সঙ্কুলান করা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। কাজ সুরু হলে গ্রামবাসীরা এগিয়ে আসবেন বলে অনেকে মনে করেন। কোন কোন গ্রামে এ হয়ত সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও গ্রামের সাহায্য প্রথমাবস্থায় কতখানি নেওয়া উচিত, তা বিচারসাপেক্ষ। প্রথম থেকেই গ্রামের সাহায্যের উপর অসহায় ভাবে নির্ভরশীল হলে গ্রামের দলাদলি, গ্রামের মনোমালিন্যের প্রভাব বিদ্যালয়কেও স্পর্শ করতে পারে।

তবে কি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব? এই কি একমাত্র নিয়তি যে, হয় গঠন-কর্মীকে একক পথ চলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, নয়তো অবাঞ্ছিত সাহায্য গ্রহণ করে আপোষের মধ্য দিয়েই চলতে হবে?

আমার বিশ্বাস একটি মধ্যবর্তী পথ রয়েছে এবং সেই পথেই স্বাবলম্বী সমাজের গোড়াপত্তন সম্ভব হবে। আমার ধারণা একক স্বাবলম্বনের পরিবর্তে গোষ্ঠী স্বাবলম্বনের কথা ভাবতে হবে। যে কাজ একক প্রচেষ্টায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, গ্রাম-সেবকদের সমবেত প্রচেষ্টায় সেই কাজই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। স্বাবলম্বন মানে নিশ্চয় নিজের চেষ্টায় সব কিছু করা নয়। কর্মীর নিজের জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য কাজগুলি স্বহস্তে করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই

থাকা চাই, কিন্তু কর্মীদের কোন বিশেষ কাজে নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সর্বতোমুখী শিক্ষা চাই ; এ পর্যায়ে শিশু স্বাবলম্বী হবার শক্তি অর্জন করবে। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বেছে নিয়ে একটা বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে। স্বাবলম্বনের যোগ্যতা ও বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি এই দুটোই পাশাপাশি থাকলে স্বাধীনতা বজায় রেখে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষাকে যিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন তাঁকে অধিকাংশ সময় তাঁর এই বিশেষ বিষয়ের চর্চার জন্য দিতে হবে। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে বাইরের কর্তৃত্ব হ'তে মুক্ত থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আজ বিকেন্দ্রিত গ্রাম-সেবক-গোষ্ঠী সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে কয়েকজন যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুসারে গ্রামের প্রত্যক্ষ কাজ হাতে নেবেন। তাঁরা গ্রামের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন, বিদ্যালয় গড়ে তোলা, ঘরবাড়ী তৈরী করা, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি করবেন। সেবক-গোষ্ঠীর অন্যেরা যতদিন না বিদ্যালয় ও গ্রাম-সমাজ, স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন অর্থ উপার্জন করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য জোগাবেন। তারপর বিদ্যালয় স্বাবলম্বনের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে এঁরাও এসে যোগ দেবেন গ্রাম-সেবকের প্রত্যক্ষ কাজে। শুধু এমনি ভাবেই কেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থা ছাড়াও গ্রাম-সেবার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনা করব। বুনিয়াদী শিক্ষার 'স্বাবলম্বন' বলতে ঠিক কি বোঝায়! অনেকের ধারণা

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বন একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এমন একটি কাজকে নেওয়া হবে, যা থেকে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপাদিত হবে এবং সেই বিক্রয়ের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের খরচ, অন্ততঃ শিক্ষকের মাসিক বৃত্তি উঠে আসবে।

আর্থিক স্বাবলম্বনই যদি বুনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে সূতাকাটা বা কৃষির কাজকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে বেছে নেবার কি কারণ থাকতে পারে? সকলেই জানেন যে, আজকাল আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা অপরিহার্য তার মান সবচেয়ে নীচু। আমরা চাষীকে বা তাঁতীকে মজুরী দেবার সময় ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য একটি টাকা দিতে ইতস্ততঃ করি কিন্তু বিলাসের খোরাকের জন্য নটীর পায়ে ১ ঘণ্টার মজুরী ১০০৲ দিতে দ্বিধাবোধ করি না; এক সের চালের দাম ১৲ দিতে হলে আমাদের কাতরাণের অন্ত থাকে না, কিন্তু এক দিনে এক টিন সিগারেট ফুঁকবার জন্য আমরা ২।৩ টাকা উড়িয়ে দিতে তৈরী হয়ে বসে আছি। সুতরাং বিদ্যালয়কে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই একমাত্র লক্ষ্য হলে সূতাকাটা বা কৃষির মত জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য কাজকে শিকায় তুলে রেখে বিড়িবাঁধা বা এসেন্স তৈরী করার মত বিলাসের পণ্য জোগাবার কাজ হাতে নিতে হয়। সে ক্ষেত্রে একটি শিক্ষার্থী এক মাসে কেন প্রতিদিন শিক্ষকের জন্য চার আনা থেকে ১।২ টাকা উপার্জন করতে পারে। আর কেবল যদি কাজের ভিতর দিয়ে কতগুলি সংবাদ পরিবেশন করাই শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তবে বিড়ি বা এসেন্স তৈরীর প্রসঙ্গেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু তথ্য পরিবেশন করা চলতে পারে।

তাহলে বিড়িবাঁধার মত কাজের পরিবর্তে সূতাকাটা বা কৃষির মত কাজকে বুনিয়াদী বিত্থালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করার মধ্যে আর্থিক স্বাবলম্বনের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। যেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জনই যদি বুনিয়াদী বিত্থালয়ের শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য হত, তবে কৃষি বা বস্ত্র শিল্পের মত কাজকে বুনিয়াদী বিত্থালয়ে কখন মূলশিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হত না। এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক স্বাবলম্বন নয়, একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই বুনিয়াদী বিত্থালয়ের প্রধান লক্ষ্য। সে আদর্শ হচ্ছে একটি বিকেন্দ্রিত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা। আত্মনির্ভরশীলতার অযোগ্য লোককে নিয়ে যে সমাজ তৈরী, তাতে স্বাধীনতা মরীচিকা মাত্র। সেই জন্য জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের ব্যাপারে যাতে প্রত্যেকটি নাগরিক আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন সে শিক্ষা দেবার জন্যই বুনিয়াদী বিত্থালয়ে বস্ত্রশিল্প বা খাত্থশিল্পের মত কাজকে গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু আদর্শের এই সীমারেখার মধ্যেও কি আর্থিক লাভের দিকে দৃষ্টি রেখেই বুনিয়াদী বিত্থালয়ের শিল্প-নির্বাচন হবে? অর্থাৎ বস্ত্র-শিল্পের মধ্যে রেশমের কাজই যদি সব চাইতে লাভজনক হয় তবে কি প্রত্যেক বুনিয়াদী বিত্থালয়ই রেশমের কাজ করার জন্যই চেষ্টিত হবে? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পাশাপাশি দুটি বিত্থালয়ের একটিতে যদি কার্পাস-শিল্প অন্যটিতে রেশম-শিল্প প্রবর্তন করা যায়, তবে একই শিক্ষক শিক্ষা দিলেও প্রথমোক্ত বিত্থালয়ের চাইতে দ্বিতীয় বিত্থালয়ের আর্থিক আয় অনেক বেশী হবে। তা হলে কি দ্বিতীয় বিত্থালয়কে অধিক স্বাবলম্বী শ্রেষ্ঠতর বুনিয়াদী বিত্থালয় বলতে হবে? আমার

দৃঢ় ধারণা 'স্বাবলম্বন' কথাটি এই অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না। পেরিয়ানায়কম পালয়মে ১৯৪৯ খৃঃঅব্দে 'নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের' যে পঞ্চম অধিবেশন হয়, তাতে আচার্য্য বিনোবা ভাবে আর্থিক মান দিয়ে স্বাবলম্বনের পরিমাপ করার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর মতে টাকার স্বভাব রূপোপজীবিনীর মত। তার নিজস্ব মূল্যের কোন স্থিরতা নাই। আজ ডি-ভেলুয়েশনের কল্যাণে কথাটা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। গতকাল যে নোটটি দিয়ে বিদেশের ১০০৲ টাকার জিনিষ কেনা যাচ্ছিল আজ তাই দিয়ে হয়ত মাত্র ৭০৲ মূল্যের জিনিষ পাওয়া যাবে। অথচ দ্রব্যের উৎকর্ষ অথবা তা তৈরী করতে যে শ্রমের প্রয়োজন তা বিন্দুমাত্র কমছে না। রাজনৈতিক কারণে টাকার বিনিময়-হার মুহূর্তে পাল্টানো চলতে পারে, অর্থনৈতিক কারণে টাকার দামের ওঠানামা তো প্রতি মুহূর্তেই চলছে। যে জিনিষের মূল্য এত পরিবর্তনশীল, তাকে অন্য জিনিষের মূল্যের পরিমাপক করা যেতে পারে কি করে? যে ফুট আজ ১২ ইঞ্চি, কাল দশ ইঞ্চি, আবার পরমুহূর্তে ১৮ ইঞ্চি হতে পারে তাকে দিয়ে যেমন কোন জিনিষের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা চলতে পারে না, তেমনি যে অর্থ নিয়ত পরিবর্তনশীল, যার মূল্য শ্রমমূল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা দিয়ে স্বাবলম্বনের পরিমাপও করা চলে না।

তবে 'স্বাবলম্বন' বলতে আমরা কি বুঝবো? প্রথমতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয় যে সমাজ গড়তে চায়, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে চায়, তা আজ আমাদের চারদিকে নেই। আজকালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদলকে নিঃস্ব করে অন্যত্র প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হতে সাহায্য

করে। এর পরিবর্তে শ্রমের ভিত্তিতে মূল্য-মান প্রতিষ্ঠা করা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পিত সমাজের আদর্শ। অর্থ কেবলমাত্র শ্রম-বিনিময়ের মান হিসাবে ব্যবহৃত হবে—শোষণের অস্ত্র হিসাবে নয়। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্বাবলম্বন বলতে কতখানি অর্থ উপার্জিত হল, বর্তমান অবস্থায় সেইটেই বড় কথা হতে পারে না। শ্রম ও বুদ্ধির সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ হল কিনা, এবং কাজের দ্বারা শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠল কিনা সেটাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্বাবলম্বনের লক্ষ্য।

একটা কথা প্রথমেই স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে, স্বাবলম্বন বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য নয়, পরীক্ষা—'acid test of it is reality.' বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য গান্ধীজীর ভাষায় to draw out the best in child, physical, mental and spiritual. মানুষের এই সর্বতোমুখী বিকাশের পরীক্ষা হচ্ছে তার স্বাবলম্বনের যোগ্যতা। যে ব্যক্তি আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার শক্তি রাখে না, যে নিজের বুদ্ধিতে নিজের সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম, যে নিজের বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের অনুশাসনের অনুসরণ করতে অসমর্থ, তার পক্ষে স্বাধীনতার চিন্তা বাতুলতা, সর্বাঙ্গীণ বিকাশ দিবাস্বপ্ন। যোগ্যতার এই মান কোন শিশু অর্জন করেছে কিনা, তার প্রমাণ কি করে মিলতে পারে? তা মিলবার উপায় হচ্ছে যদি কোন শিশু নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের বুদ্ধির প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন সুপরিকল্পিত কোনো কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে কিনা। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন বলতে যোগ্যতার এই পরীক্ষাই বোঝায়।

প্রথমতঃ, জীবনের একান্ত অপরিহার্য দ্রব্যের মালমশলা নিজের পরিবেশ থেকে বেছে নেবার মত বুদ্ধি, শিক্ষা ও শক্তি শিশুর এই ৭ বছরে জন্মানো চাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই সব কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী, মেরামত ও সংগ্রহ করার শিক্ষা শিশুর এই ৭ বছরে হওয়া চাই।

তৃতীয়তঃ, নির্দিষ্ট বয়সে ও শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করা চাই।

চতুর্থতঃ, ৭ বৎসর শিক্ষার শেষে প্রত্যহ ৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য ব্যবস্থা করার সামর্থ্য জন্মানো চাই।

পঞ্চমতঃ, ৭ বৎসর শিক্ষার শেষে উপযুক্ত পুঁথি ও সরঞ্জমাদি পেলে নিজের চেষ্টায় নিজের কাজ ও শিক্ষাকে উন্নত করার যোগ্যতা শিক্ষার্থীর অর্জন করা চাই।

এক কথায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্পর্কে ও শিক্ষা সম্পর্কে ৭ বছর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। বিদ্যার্থীরা উপরোক্ত সামর্থ্য অর্জন করা সত্ত্বেও যদি বিদ্যালয় আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী না হয়, তবে সে অর্থ-মানের দোষ, শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি নয়।

আর্থিক স্বাবলম্বনকে স্বাবলম্বনের অর্থ বলে নির্দেশ করার কতকগুলি বিপদ আছে, এবারে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অর্থের মূল্য নানা রাজনৈতিক ও অর্থনীতিক কারণে সর্বদাই পাল্টায়। আজ যে জিনিষের দাম ১৲ টাকা, কাল সে জিনিষের দাম ২৲ টাকা হওয়া বিচিত্র নয়। আবার এক জিনিষের দাম যে হারে বাড়ে বা কমে, অন্য জিনিষের দামও সেই

হারেই বাড়বে বা কমবে, তার কোন স্থিরতা নেই। ফলে আজ কৃষি কাজ করে যে শ্রেণী মাসে ৩০৲ টাকা উপার্জন করছে, আগামী বৎসর একই সমান কৃতিত্বের সঙ্গে সমান সময় কাজ করে এই শ্রেণীই মাসে ২০৲ অথবা ৬০৲ উপার্জন করতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র টাকার অঙ্কের হিসাব করে শ্রেণীর কৃতিত্বের কোন পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আবার এ বৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসর কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২০৲ হারে অথচ কার্পাসজাত দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫৲ হারে বাড়তে পারে। ফলে কৃষিকাজ করে এক শ্রেণীর আয় অনেক বেড়ে গেলেও প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পের কাজ করতে গিয়ে অন্য শ্রেণীর আয় বাড়তে নাও পারে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষকের বৃত্তি ২৫৲, ৩০৲ কিংবা ৫০৲ এর কম একটা কিছু চিরকালের মত স্থির করে রাখা সম্ভব নয়। ক্ষুৎপিপাসার্ত শিক্ষক যোগ্যভাবে শিক্ষাদানের কাজ করতে পারেন না। মূল্য-মানের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি সচ্ছল ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষণীয় হওয়া সম্ভব ; কিন্তু শিক্ষকের বৃত্তি জীবন-ধারণের সর্বনিম্ন মানের এত কাছাকাছি থাকে যে, মূল্যের সামান্যতম তারতম্যও তাঁর পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রে পেয়াদা-পিয়নেরও মাইনের চেয়ে একটা স্বল্পতর বৃত্তি নির্দিষ্ট করে রাখা শিক্ষার ব্যবস্থাপকদের মূঢ়তারই লক্ষণ। উপযুক্ত ভাবে শিক্ষাদান করতে হলে শিক্ষককে আর্থিক অনটনের উর্ধ্বে থাকতে হবে। কিন্তু সমগ্রভাবে জীবন ধারণের মূল্য-মান বাড়া-কমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের নির্বাচিত শিল্পের মূল্য-মান একই হারে বাড়বে বা কমবে, এ আশা করা যেতে পারে না। সুতরাং আর্থিকভাবে আজ যে বিদ্যালয় স্বাবলম্বী,

কাল সে বিদ্যালয় স্বাবলম্বী নাও থাকতে পারে। অথচ তার জন্য বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব, শিক্ষকের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ কিছুমাত্র কমেছে, একথা বলা চলে না। এক কথায় আর্থিক স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উৎকর্ষের কোন পরিমাপ চলতে পারে না।

যাতে মূল্য-মান বাড়া-কমার ওপর শিক্ষককে একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে না হয়, সেজন্য বিদ্যালয়ে অর্থকরী শিল্পকে গ্রহণ না করে জীবনের জন্য অপরিহার্য দ্রব্য-উৎপাদনের কাজকেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মূলশিল্প রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষক ২৫।৩০টি ছাত্রের সাহায্য নিয়ে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য কাজগুলি করবেন, তারই মধ্য দিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদিত হবে এবং এরই মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান পাবে। নীতিগতভাবে এ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা গেলেও বাস্তবে এর মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থীর উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান তার পিতামাতাই করবেন। নীতির দিক দিয়ে এই সিদ্ধান্তে কোন ত্রুটি নেই। যে মাতাপিতা সন্তানের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারেন না, তাঁদের পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়া অনুচিত। এসব কথাই সত্য। কিন্তু যা উচিত তার সবটুকুই যদি বাস্তব হ'ত, তবে আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন হত না। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য হচ্ছে এই যে, আজ ভারতের গ্রামে গ্রামে শতকরা নব্বুইটি শিশুর জন্য উপযুক্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান নেই। তার অনেকখানি হয়ত মা-বাপের অজ্ঞতার ফলে, আবার অনেকখানেই আজকালের সমাজ-ব্যবস্থার ফলে। এই ব্যাপক

কারণকে একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। আর তা যতদিন না হয় ততদিন শিশুর পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্রে শিক্ষকের পরিবারের বস্ত্রাভাব ঘুচবে আর শিশু অর্ধনগ্ন থাকবে, শিশুর উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যে শিক্ষকের পরিবারের খাদ্যাভাব দূর হবে, আর শিশু নিজে থাকবে পুষ্টির অভাবে রুগ্ন হয়ে, এ এক অদ্ভুত পরিহাস। অন্যদিকে শিক্ষক সারাদিন শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থেকে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিজের শ্রমে করবেন—এও সম্ভব নয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের উৎপাদিত দ্রব্যে শিক্ষকের অভাব মিটবে, এ আশাও অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে করা দুরাশা। বিদ্যালয়ে উৎপাদিত বস্ত্র থেকে সর্বপ্রথমে শিশুর বস্ত্রের অভাব মিটাবার ব্যবস্থা করতে হবে, বিদ্যালয়ে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যে সর্বপ্রথমে শিশুর পুষ্টির অভাব দূর করতে হবে ; এর পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকবে ততটুকুই শিক্ষকের প্রাপ্য হবে। সুতরাং বিদ্যালয়ের উৎপাদন থেকে শিক্ষকের অভাব প্রথমাবধিই ঘুচবে এ আমার মনে হয় না। শিক্ষার্থীরা যদি যথার্থ শিক্ষামূলকভাবে উপযুক্ত পরিমাণ শিল্পকাজ করতে পারে, যদি তার মধ্য দিয়ে শিশুর যথোচিত শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ হয়, তবে তা দিয়ে শিক্ষকের বৃত্তির বা জীবিকার ব্যবস্থা না হলেও তাকে স্বাবলম্বী বিদ্যালয় বলা হবে বলে আমি মনে করি।

অপর দিকে যাঁরা উৎপাদনের কথাটা একেবারে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন, তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে যান বলে আমার ধারণা। এঁদের অনেকে 'জাকির হোসেন কমিটির' উদ্ধৃত অংশটিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন : "এই পরিকল্পনায় একটি সুস্পষ্ট আশঙ্কা রয়েছে ; সেটি হচ্ছে—এই পরিকল্পনা কার্যকরী

করতে গিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক উদ্দেশ্যগুলিকে অবহেলা করে অর্থনীতিক দিকের উপর বেশী জোর দেওয়া হতে পারে। শিক্ষকেরা তাঁদের অধিকাংশ মনোযোগ এবং উৎসাহ শিশুদিগকে যথাসাধ্য পরিশ্রম করার দিকে নিয়োগ করে কারুশিল্প শিক্ষার মধ্যে যে বুদ্ধিগত, সমাজগত, নীতিগত অর্থ ও সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে অবহেলা করতে পারেন।" একদা জুলিয়াস সীজার পড়তে গিয়ে ব্রুটাসের সীজার-হত্যার যুক্তি পড়েছিলাম মনে আছে। সীজার কি কি দুষ্কার্য করতে পারেন ব্রুটাস মনে মনে তার একটা ফর্দ কসে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যেহেতু সীজার এমন ধারা সব অপকর্ম করতে পারেন সেজন্য তাঁকে হত্যা করতেই হবে। শিক্ষকেরা বুনিয়াদী শিক্ষার বুদ্ধিগত ও সংস্কৃতিগত তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে যান্ত্রিক কাজকে প্রাধান্য দিতে পারেন, এই আশঙ্কায় যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাণপদার্থ উৎপাদনমূলক কাজকে বাদ দিতে চান, তাঁদের যুক্তিটাও অনেকটা সেই রকম। বুনিয়াদী শিক্ষা যদি একটি ভাল শিক্ষাব্যবস্থা হয়, তবে কেবলমাত্র তার অপব্যবহার হতে পারে এই যুক্তিতেই তার বিকৃতি ঘটানো উচিত নয়। ভোঁতা ছুরির অপব্যবহারের ভয় সামান্য, শাণিত অস্ত্রের অপব্যবহারই মারাত্মক। যা ভাল তার অপব্যবহার প্রায়শঃ অত্যন্ত খারাপ ফলপ্রসূ, ধর্মের নামেই সবচেয়ে বেশী জুচ্চুরী হয়, বিত্তের সঙ্গেই শোষণের ঘনিষ্ঠ যোগ, তাই বলে অপব্যবহারের আশঙ্কায় ভাল জিনিষকে সম্পূর্ণ বর্জনের যুক্তিকে আমরা অন্যত্র বিচারসহ বলে মনে করি না।

আবার অনেকে বলে থাকেন যে, শিল্পকাজ থেকে শিক্ষামূলক শিল্প সম্পূর্ণ আলাদা। শিক্ষা ব্যাপারে শিশু শিল্প কাজ করতে

গিয়ে কি শিখল সেটাই প্রধান কথা, কি তৈরী করল এবং কতখানি করল সেটা উপেক্ষণীয়। আনন্দের সঙ্গে শিশু কাজ করছে কিনা এবং কাজ করতে করতে কিছু শিখছে কিনা এটাই হবে শিক্ষাবিদ্দের একমাত্র বিচার্য। যেখানে কাজটা বিলাস, সেখানে এই বিচার প্রযোজ্য হলেও বুনিয়াদী শিক্ষার বিচারে এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয় বলে আমার বিশ্বাস। উপরোক্ত ক্ষেত্রে শিশুর আনন্দ ও খামখেয়ালের মধ্যে কোনা সীমারেখা টানা হয় না। শিশু যাতে আনন্দ পাবে তাই সে করবে, কথাটা শ্রুতিসুখকর হলেও শিক্ষার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। যা ভাল, যা সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক, তা করতে শিশু আনন্দ পেতে শিখবে, এটাই হচ্ছে শিক্ষার দিক থেকে বড় কথা। যা করতে আমার ভাল লাগে তাই আমি করব, এ হচ্ছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির বুলি। এই শিক্ষার ফলেই আমরা সমাজে এত স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এত প্রতিযোগিতা, এত হানাহানি দেখতে পাচ্ছি। বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজ গড়ে তুলতে চায়, তাতে ব্যক্তির ও সমাজের স্বার্থ অভিন্ন হয়ে উঠবে। ব্যক্তি সমাজেরই একজন, সমষ্টির যাতে মঙ্গল, ব্যক্তির তাতেই মঙ্গল, এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশুকে গড়ে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং শিশুর সাময়িক খেয়াল যে কাজের উৎস, তা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একমাত্র এমন কি প্রধান কাজও হতে পারে না। শিশুর একান্ত ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্খা, খেয়ালকে রূপ দেবার মত কাজের অবসর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা শিক্ষার প্রধান অবলম্বনরূপে নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাতে উৎপাদনটাই একমাত্র লক্ষ্য বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা অবশ্যই ভুল করেন। শিক্ষামূলক কাজ মাত্রেরই

লক্ষ্য যেমন শিক্ষা, উৎপাদন নয়, তেমনি বুনিয়াদী শিক্ষার ও শিল্প-কাজের লক্ষ্য শিক্ষা, উৎপাদন নয়। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের মঙ্গল যে শিক্ষামূলক কাজের লক্ষ্য, তার উৎকর্ষের প্রমাণ কি? এখানেই পরিমাপের দণ্ড হিসাবে উৎপাদনের স্থান। বুনিয়াদী শিক্ষাতে কি রকম কাজ কেন মূলশিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।* এই কাজ আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বুদ্ধিযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ যথাযথভাবে বিচার করে। সূতাকাটার কথা ধরা যাক্। সূতাকাটায় উৎপাদনই যদি প্রধান বিবেচ্য হত, তবে বুনিয়াদী শিক্ষায় টাকুতে সূতাকাটার কোন স্থান থাকতো না, ধনুকে ধুনাই করে বা হাতে তুলাই করে সূতাকাটা সম্পূর্ণ বর্জনীয় হত। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে এই সব যন্ত্রের প্রস্তুতি ও ব্যবহার প্রয়োজন বলেই বুনিয়াদী শিক্ষায় এ সব যন্ত্রের ব্যবহার বা প্রক্রিয়া শেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু একবৎসর শিক্ষা লাভ করার পরও যদি শিক্ষার্থী একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতা কাটতে না পারে,—সে সূতা যদি শিশুর বয়স অনুযায়ী শক্তি ও সমানতা-সম্পন্ন না হয়, যদি সেই সূতার চিক্কণতা তূলার আঁশের গুণানুযায়ী না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, শিক্ষার কোথাও কোন ত্রুটি আছে, নয়তো শিশুর দৈহিক অথবা মানসিক গঠনে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। অর্থাৎ উৎপাদন এখানে লক্ষ্য নয়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল। Intelligence Test দ্বারা যেমন মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়, তেমনি শিল্পকাজে উৎপাদনের গুণ ও

* "বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পকাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পরিমাণ থেকে এবং সে সম্পর্কে শিশুর ধারাবাহিক বিবৃতির মধ্য দিয়ে তার শিক্ষা, বিকাশ ও চারিত্রিক বহুবিধ গুণের নিখুঁত পরিমাপ করা চলতে পারে। শিক্ষার্থীর ঝোঁক, দক্ষতা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, মনোযোগ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির পরিমাপ করার পক্ষে শিক্ষামূলক শিল্প ব্যাপক মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

অন্য দিকে যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বনকে স্বীকার করেন, তাঁরা মনে করেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য খরচপত্রের কোন দরকার নেই। এই ধারণার মধ্যে একটা মারাত্মক রকমের ত্রুটি আছে। এ সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা কোন মতে একটা বিদ্যালয়-ঘর খাড়া করে দিয়ে অথবা কয়েকজন কর্মীকে শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত করেই নিজেদের দায়িত্বমুক্ত মনে করেন এবং আশা করেন যে, যেহেতু বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলম্বী শিক্ষা সেই হেতু এর জন্য আর কোন খরচ করার প্রয়োজন নেই। এই অদূরদর্শিতার জন্য অন্ততঃ বাংলাদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে বলে জানি। যে কোন শিল্পকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের মত বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরও প্রাথমিক খরচ চলতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাইতে অনেক বেশী। পুঁথি যেখানে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম, সেখানে ঠেসেঠুসে যতগুলি ছেলেমেয়েকে একটা ঘরে পোরা যায়, ততজনকেই শিক্ষা দেওয়া চলে। কিন্তু যেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবার, সেখানে কাজ করার মত যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজন। তাছাড়া যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার জন্যও যথাযোগ্য স্থানের প্রয়োজন। শিক্ষক এ ক্ষেত্রে যত জন খুশী বিদ্যার্থীকে পাঠ

দিতে পারেন না, কারণ কাজের মধ্য দিয়ে শেখাতে গেলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, শিল্পের উপাদান, গ্রন্থাগার ইত্যাদির জন্য প্রাথমিক ব্যয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের উৎপাদন থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রথম থেকেই স্বাবলম্বী হতে পারে না; কখন যে পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারবে তার শেষ সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তবে এইটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বত্রই পাওয়া গেছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা যত এগিয়ে চলে, শিশুর উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ ততই বাড়তে থাকে। এ জন্য এক জায়গায় গান্ধীজি বলেছেন যে: আমার তো ৭ বছরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে স্বাবলম্বনের সঙ্গে; ৭ বছরে বিদ্যালয় স্বাবলম্বী না হয় ৯ বছরে হবে। সুতরাং যতদিন আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে নিখুঁত করে তুলতে না পারছি ততদিন ৭ বছর কেন তার চেয়েও বেশী সময় আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যয়ভারের অনেকখানি বহন করতে হবে।

অপর পক্ষে অর্থাভাবের অজুহাতে বিভিন্ন সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকালকে ৭।৮ বছর থেকে ছেঁটে যে পাঁচ বছরের করছেন তাও বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে মারাত্মক। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে কতকগুলি বুলি শেখানো নয়; তার মধ্যে কর্মে, চিন্তায়, আত্মশক্তিতে ও শিক্ষা-ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার শক্তি সঞ্চার করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন কর্মের ও স্বাধীনভাবে শিক্ষা-লাভের কতকগুলি অভ্যাস গড়ে উঠবে এই আশা করা হয়। এই

স্বভাব গড়ার পক্ষে প্রথম পাঁচ বছর ক্ষেত্র-প্রস্তুতির কাল মাত্র। ১১ বছর বয়সে শিশুকে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নিলে তার মধ্যে এই সকল অভ্যাস দানা বেঁধে উঠতে পারে না এবং ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এত খরচপত্র করে স্বেচ্ছায় বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবার কোন যুক্তিসহ কারণ আছে কি না জানি না। তাই যদি পাঁচ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্তই করতে হয়, তবে বরং বুনিয়াদী শিক্ষাকাল ১১ থেকে ১৫ এই পাঁচ বছরই হওয়া উচিত। স্বাবলম্বনের দিক থেকে ৬ থেকে ১১ এই পাঁচ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রথম পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরই বুনিয়াদী বিদ্যালয় দ্রুত স্বাবলম্বনের দিকে এগিয়ে চলে। তাই বিদ্যালয়ের শ্রেণী পর পর যত বাড়ে, বিদ্যালয়ের ব্যয় ততই না বেড়ে কমতে থাকে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উৎপাদন-মানের হিসাব দেখলে আমরা দেখতে পাব যে, প্রথম দুই শ্রেণীতে শিশু যা উৎপাদন করে, তাতে শিল্পের উপাদানের খরচটুকু মোটামুটি উঠে আসে। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতি শিশুর মাসিক উৎপাদনের মজুরী প্রায় এক টাকা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতে পারে।* চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে এই সময় খানিকটা বাড়লেও খুব বেশী বাড়ে না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা শিল্পকাজের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু করে। অর্থাৎ সূতাকাটার কাজ এ পর্যায়ে কাপড় বোনা রঙ করায় পরিণতি লাভ করে, বাগানের কাজ, কৃষি, পশুপালনের জটিলতর কাজ এবং ধাতুর যন্ত্রপাতি তৈরী করার কাজও এই পর্যায়ে সুরু হয়। এই সময় থেকে মূল শিল্পকাজের দ্বারা বিদ্যালয়ের আয়

* ২৪ পরগণা জেলার গোটর বিদ্যালয়ের হিসাব দ্রষ্টব্য।

অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। বিহার সরকারের হিসাব থেকে দেখতে পাই যে, যেখানে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা উপার্জন করছে বছরে জনপ্রতি ৭॥৶০, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা সেখানে উপার্জন করছে ৩৩৷৴০ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্ররা ৬৯৵০ ; * অর্থাৎ ৭ম শ্রেণীতে একটি শিক্ষার্থীর মাসিক আয় দাঁড়াচ্ছে ৫৸০, এই হিসাবে ২৫টি ছাত্রের একটি শ্রেণীতে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের উপার্জন থেকে আয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫৫৲। এই এই আয় ক্রমশঃ আরো বেড়ে যেতে থাকবে বলেই আমরা আশা করি। সুতরাং ব্যয়বহনের অক্ষমতার অজুহাতে সরকার যদি ৫ম শ্রেণীর পর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাট উঠিয়ে দিতে চান তবে তাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলা চলে না ; বরং বলা যেতে পারে যে, ঠিক যে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বনের সম্ভাবনা সূচিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই তার অগ্রগতিকে চেপে দেওয়া হচ্ছে। এজন্য ১৯৪৯খৃঃ অব্দে পেরিয়ানায়কম্ পালয়মে নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের ৫ম অধিবেশনে 'হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের' সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেন বলেছিলেন যে, যদি কোন সরকার বলেন যে, তাঁদের পাঁচ বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করার সাধ্য আছে কিন্তু আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে, তবে বলতে হয় যে, তাঁরা কি বলছেন তা জানেন না, নয়তো তাঁরা জেনে শুনেই ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলছেন। যে আর্থিক সামর্থ্যে পাঁচ বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, সেই আর্থিক ব্যয়েই আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা

* Progress of Basic Education in Bihar during the year ending the 31st March 1948.

চলে। ৫ বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা মানে জেনে শুনে জনসাধারণের অর্থ জলে ফেলে দেওয়া, কারণ এই ব্যবস্থায় ঠিক যে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা সার্থকতার বা স্বাবলম্বনের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছায়, সেই মুহূর্তেই তার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। জাকির সাহেবের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির' মন্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা হয়েছে : Basic education from 6—14 is an organic whole and will lose much of its value if not so treated ; in any case an education which lasts only five years and ends about the age eleven, cannot be regarded as an adequate preparation either for life or livelihood.*

পরিশেষে আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশ গরীব্ বলেই গান্ধীজি বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বন কথাটির ওপর এত জোর দিয়েছেন। গান্ধীজি নিজেও একথা অনেকবার বলেছেন। তবু মনে হয় এ ব্যাখ্যা স্বাবলম্বনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। আমাদের দেশ যে নিতান্ত গরীব দেশ নয়, প্রয়োজন পড়লে এদেশ যে কোটি কোটি টাকার ঐশ্বর্য উৎপাদন করতে পারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলেই আমার ধারণা। এই সমিতির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-সংগঠনের বিবরণীতে

* Post-war Education Development in India.

বলা হয়েছে : The expenditure involved is admittedly heavy but the experience of war suggests that when a paramount necessity can be established, the money required to meet its demand will be found. It is for India to decide whether the time has arrived when a national system of education is a paramount necessity."* দারিদ্র্যই যদি শিক্ষায় স্বাবলম্বনের হেতু হয়, তবে আমাদের দেশে স্বাবলম্বনের প্রয়োজন নেই, বলায় আপত্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশ একান্ত দরিদ্র না হলেও, জাতীয় সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করলে জাতীয় শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব না হলেও, আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শিক্ষার এই একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়নি। আমরা বলে থাকি যে, ইংরেজ অর্থাভাবের শিখণ্ডীকে সামনে খাড়া করে আমাদের জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতিকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। আজ প্রায় তিন বৎসর ইংরেজ এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এই দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক আমরা নিজেরাই, আজ আর পদে পদে দোষ মাত্রকেই ইংরেজের ঘাড়ে চাপান চলে না। সত্যি বটে বহুকালের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলে খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের চলার পথকে ইংরেজ পদে পদে যথাসাধ্য কণ্টকিত করে রেখে গেছে, তবু শিক্ষাকে একটি সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা বলে গ্রহণ করতে আমরা রাষ্ট্রের প্রাণপণ আগ্রহ দেখেছি একথা বলতে দ্বিধা হয়। এ সময়ের মধ্যে আমরা প্রতিদিন

* Post-war Educational Development in India.

বিচিত্র রকমের সরকারী পরিকল্পনা গজাতে দেখেছি, মন্ত্রীদের বেতন বেড়েছে, ইংরেজ আমলের বড় বড় দেশদ্রোহী কর্মচারীদের পদমর্যাদা, প্রভাব ও ভাতা হু হু করে বেড়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে শূন্য ভাণ্ডারের ঝুলি আজও বিরাট মুখব্যাদন করে আছে। শিক্ষাকে বিশেষতঃ আবশ্যিক অবৈতনিক পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার কারণ বর্তমান সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক স্থিতির মধ্যেই আছে। শিক্ষা আজকাল চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র মাত্র। সুতরাং চাকুরীর ক্ষেত্রকে অলঙ্কৃত করে যাঁরা আজ রয়েছেন, মোটা মাইনের কল্যাণে যাঁরা নিজের সন্তান-সন্ততির উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে চাকুরীর বাজারে তাদের অগ্রাধিকারের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাঁদের পক্ষে সার্বজনীন শিক্ষার প্রসাদে চাকুরীর ক্ষেত্রে ভীড় বাড়ানোর ব্যবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ফলে তাঁরা সার্বজনীন শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে নারাজ, আর মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও কোন ছুতো পেলেই সার্বজনীন শিক্ষার নৌকাকে বানচাল করে দেবার জন্য উদগ্রীব। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই অবস্থাই দেখতে পাই। চাকুরীর ক্ষেত্রে যারা ঠাঁই পায় না, তারা ছড়িয়ে পড়ে অর্থনীতির নানা বিভাগে। শিল্পপতিদের কাছে শিক্ষিত শ্রমিক বা বেকার উভয়েই সমান ভীতিপ্রদ। তাঁদের ধারণা এরা শুধু শ্রেণী-সংঘর্ষকেই ডেকে আনবে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দেখি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বতোভাবে ধনিক ও চাকুরিয়াদেরই হাতে। জনসাধারণ শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রাধান্যের জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দেবে এমন শিক্ষা বা সংগঠন কোনটাই তাদের নেই। অদূর ভবিষ্যতে প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার পেতে যাচ্ছেন কিন্তু আজকার পরিস্থিতিতে

তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনপ্রকার স্বাধীনতা আছে কিনা তা সন্দেহের বিষয় ; আর যদি তা না থাকে, তবে তাঁদের প্রভাব রাষ্ট্রের ওপর প্রতিফলিত হবে না একথা নিশ্চিত। অপরপক্ষে নিজের লাভের অঙ্ককে, পুত্রকলত্রের সুনিশ্চিত উন্নতির পথকে সঙ্কীর্ণ করে ধনিক ও চাকুরীয়ারা জনসাধারণের শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবেন, তা আজকের দিনে একান্তই দুরাশা। রাষ্ট্রকর্ণধাররা আই. সি. এস. ; আই. সি. এস.-রা আপনাদের দেশভক্ত বলে যত বড় সার্টিফিকেটই দিন না কেন, শিল্পপতিদের স্বীয় স্বার্থের যত বড় স্তম্ভ বলেই প্রচার করুন না কেন, দশের মঙ্গলকে নিজের মঙ্গল বলে ভাবতে এঁরা কখনও শেখেন নি, সমগ্রের লাভেই অংশের প্রকৃত লাভ, এ শিক্ষা তাঁরা কখনও পান নি। সুতরাং একদিন যাঁরা ব্যক্তিগত উন্নতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য দেশবাসীকে হত্যা করেছেন, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, যাঁরা ক্ষমতাকে করায়ত্ত করবার জন্য একদিন ইংরেজপ্রশস্তি গেয়েছেন, তাঁরা আজ সেই কারণেই অন্যের প্রশস্তি গাইছেন ; যাঁরা একদিন অর্থলোলুপতায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, তাঁরা আজ একই কারণে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ, চিনি-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। এর কোন ব্যতিক্রম নেই, এমন কথা বলি না, কিন্তু সেটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। মানুষ রাতারাতি ভোল বদলাতে পারে, কিন্তু মানসিক গঠন পাল্টাতে পারে না। দেশ স্বাধীন হলেও পরিস্থিতি একই রয়ে গেছে।

এই অবস্থার জন্য নেতাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। পোষাক পাল্‌টে ব্যাধিকে দূর করা যায় না। স্বাধীনতা যখন আমাদের হাতে এসেছে তখনও আমরা স্বাধীনতার যোগ্য হইনি, তাই আমাদের

এই দুর্দশা। আজ দেশের অগণিত জনসাধারণ তাঁদের নিজেদের মঙ্গলের দাবী নিয়ে নেতাদের পেছনে দাঁড়াতে অক্ষম, তাই নেতারাও আজ দুর্বল। সমষ্টির কল্যাণে যে ব্যক্তির মঙ্গল একথা ভুলে গিয়ে আমরা আজ সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিগত স্বার্থের মৃগতৃষ্ণিকায় মত্ত, তাই আমাদের লাঞ্ছনা, অপমান, দুরদৃষ্ট এমন অতলস্পর্শী।

এই পরিস্থিতির দিক দিয়ে বিচার করলে গান্ধীজির স্বাবলম্বনের পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তব দূরদর্শিতা আমাদের চোখে পড়বে। জাতীয় শিক্ষার 'Paramount necessity' স্বীকার করে নিলে অর্থের অভাবে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার কোন কারণ নেই। জাতির পক্ষে যা জীবন-মরণের সমস্যা, অর্থের অভাবে তা অসমাপ্ত থাকে না, কারণ কাজের জন্য যা প্রয়োজন তা অর্থ নয়, তা হচ্ছে কায়িক শ্রম, বুদ্ধি আর কাঁচা মাল। শিক্ষার ব্যাপারে এ তিনটি বিষয়ে কোনো ব্যক্তিরই পরনির্ভরশীল হবার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষাকে 'Paramount necessity' বলে স্বীকার করবে কে? সরকারের প্রধানতম প্রচেষ্টা জাতীয় শিক্ষার প্রতি নিয়োজিত করতে সরকারকে বাধ্য করবে কে? আজ যাঁরা সরকারী ব্যবস্থার কর্ণধার এ ব্যবস্থা তাঁদের স্বার্থবিরোধী বলে তাঁরা মনে করেন, আর জাতির যাঁরা বৃহত্তর অংশ, তাঁরা পঙ্গু, শিক্ষার অভাবে তাঁরা তাঁদের ওপর জাতীয় নীতির ফলাফল পর্যন্ত বিচার করতে অক্ষম। তাই গান্ধীজি ডাক দিয়েছিলেন গঠনকর্মীদের, সেবাব্রতীদের, প্রকৃত শিক্ষাবিদ্দের জাতির সামনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে, তাকে তার আত্মশক্তির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে, নিজের আত্মশক্তিতে, নিজের ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যের মরা গাঙ থেকে সৌভাগ্যের নূতন খাতে প্রবাহিত করার

জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। এই-ই গান্ধীজির 'silent social revolution.' বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে এ পরিকল্পনার প্রয়োজন ইংরেজ আমলে যতখানি ছিল আজকার তথাকথিত স্বাধীন ভারতে ততোখানিই আছে।

সরকারী ভাণ্ডারের ঔদাসীন্যের বাস্তব কারণগুলির দাওয়াই হিসাবে স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও এটাই স্বাবলম্বন সম্পর্কে চরম কথা নয়। স্বাবলম্বনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষের ভালবাসাকে কামনামুক্ত, তার আত্মাকে সপ্রতিষ্ঠ করবার জন্য। মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" স্বাধীনতা ও পরনির্ভরতা দুটি পরস্পর-বিরোধী কথা। স্বাধীনতা, প্রতিদিন নিরাপদে ভালবাসা ছাড়া শোষণহীন সমাজ অসম্ভব, পরাবলম্বীদের মধ্যে সহযোগিতা উপহাস্য। স্বাবলম্বনের প্রয়োজন স্বাধীনতার যোগ্য, স্বাধীনতায় সমর্থ, স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণে অকুণ্ঠ মানুষ গড়ে তোলার জন্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় বলা চলে: The one practical question which has to be answered, before all else, is the economic question—what adjustments should be made, whereby such institutions can naturally maintain themselves and one day be independent, not only of the patronage of the rich, but also, the dead imposition of their own accumulated funds. The wealth and honour which, once for all, are bequeathed to us; which we do not have to earn or produce;

which never cease to be, whether we deserve them or not—these gradually and inevitably cripple our life and is sure to make us indolent and exclusive, bringing about stagnation of soul....Our truly national organisation should be made to earn its own necessities by its own constant efforts, and thus perpetually keep in real touch with the life of the future ages and not continue its existence as a parasite feeding upon the charity of the past.

স্বাবলম্বন সম্পর্কে এইটেকেই চরম কথা বলে আমি মনে করি যে, স্বাবলম্বনকে ঋষির দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, গান্ধীজি তাকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। স্বাবলম্বন সম্পর্কে এই তত্ত্ব শাশ্বত সত্য এবং সেই জন্যই তা দেশ-কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে ইটন, হ্যারোর ছাঁচে গড়বার কথা অনেকে ভেবে থাকেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে সৎ ও অনুসরণযোগ্য অনেক কিছু আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মূলতঃ এই সকল বিদ্যালয় ভোগ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংস্কৃতি এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিলাসকে কায়েম রাখতে গেলে, শোষণকেও কায়েম রাখতে হয়, একথা ভুললে চলবে না। তাই স্বাবলম্বী বিদ্যালয় বাস্তবতা ও আদর্শের দিক থেকে কেবল আমাদের নয়, সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা-পরিকল্পনায় লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আগাগোড়া সহশিক্ষা প্রবর্তিত হবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে যাঁরা দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন, তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, বিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ শ্রেণীতে (১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত) সহশিক্ষা হওয়ায় কোন বাধা নেই ; কিন্তু ২য় পর্যায়ে সহশিক্ষা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় নয়, আর সম্ভবও নয়। তাঁরা মনে করেন যে, ১১ বছর বয়সের পর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাঠদানের ব্যবস্থা করলেঃ (১) তাদের নৈতিক অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে ; (২) এই বয়সে নরনারী-ভেদে শিক্ষার্থীদের বিভিন্নপ্রকার জীবনযাত্রা ও সামাজিক কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করতে হবে ; সুতরাং একসঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে গেলে শিক্ষার বিষয়বস্তু উত্থাপনেও অসুবিধা হবে ; (৩) এই বয়সে গোড়ার দিকে মেয়েরা এবং ১৩।১৪ বছর বয়সের পর ছেলেরা বয়সের অনুপাতে মানসিক দিক দিয়ে দ্রুততর পরিণতি লাভ করে। সুতরাং বয়স এক হলেও গোড়ার দিকে মেয়েরা এবং শেষের দিকে ছেলেরা বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণতায় পরস্পরের চাইতে অনেক এগিয়ে যায়। অতএব সমবয়স্ক অসমবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের একই সঙ্গে একই শ্রেণীতে পাঠদানের অসুবিধা আছে।

এই আপত্তিগুলি যদি সত্য হয় তবে সমগ্র জাতির জন্য সার্বজনীন আবশ্যিক ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা কথার-কথাই হয়ে দাঁড়াবে এমন সন্দেহ করার কারণ রয়েছে। গ্রামে

গ্রামে মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য আলাদা আলাদা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকবে এ আজকের দিনে স্বপ্ন-বিলাস। সাধারণতঃ আমাদের দেশে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে ৪টি শ্রেণীর জন্য এক কিংবা দুইজন শিক্ষক থাকেন। তিন বা চার জন শিক্ষক আছেন এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই অল্প। এই শিক্ষকদের অবস্থাও সকলেরই পরিজ্ঞাত। বিদ্যালয়ের জন্য গ্রামের লোকের ভাবনা খুবই কম। নিজেদের অন্নচিন্তায় তাঁরা এতই মগ্ন যে, শিক্ষকদের ব্যবস্থার কথা বোধ হয় তাঁদের স্বপ্নেও স্থান পায় না। শতছিদ্র চাল, ভাঙ্গাধ্বসা দেয়াল, দরজা-জানালা-বিহীন বিদ্যালয় ঘরগুলি গ্রামের পরম দৈন্য ও শিক্ষার প্রতি চরম ঔদাসীন্যের নীরব সাক্ষী। সুতরাং বাস্তবতার দিক থেকে গ্রামে দুইটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কল্পনা একান্তই অবাস্তব। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে লালন করাই যদি গ্রামের পক্ষে এমন অসম্ভব হয়, তবে কোঠা বাড়ী ও সাজসরঞ্জামযুক্ত দুই দুইটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে পোষণ করা এক একটা গ্রামের পক্ষে কতখানি অবাস্তব তা সহজেই অনুমেয়। সরকারী তহবিল যে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যাপারে অকস্মাৎ স্ফীত ও প্রসন্ন হয়ে গ্রামে গ্রামে দুটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে, সে রকম মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। গ্রামবাসী প্রত্যেকে শিক্ষা-কর দিই বলে আমাদের প্রত্যেকটি সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার করবেন, এ আশায় থাকলে হয়ত আমাদের অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আজকার কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার প্রকৃতিই এমন যে, তা বহুর ধনকে মুষ্টিমেয়ের সেবায় নিয়োজিত করতে বাধ্য। আর অন্যত্র আমি প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছি যে,

কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টায় ও কর্তৃত্বে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে ওঠা এই শিক্ষা-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।*

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আগাগোড়া সহশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে কয়েকটি গ্রামে মিলে হয় ছেলেদের নয় মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের হয় রোজ হেঁটে সে সকল বিদ্যালয়ে যেতে হবে, নয় ছাত্রাবাসে থেকে উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমটি অবাঞ্ছনীয়, দ্বিতীয়টি অসম্ভব। ১১।১২ বছরের ছেলেমেয়েদের সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়। এই দায়িত্ব নেওয়া শিক্ষার দিক থেকে খুবই বাঞ্ছনীয়, কারণ এর মধ্য দিয়েই গৃহীত শিক্ষাকে গৃহের পরিবেশে সঞ্চারিত করার সবচেয়ে বড় সুযোগ। সুতরাং এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা বাড়ী থেকে শিক্ষালাভ করবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া রোজ কয়েক মাইল হেঁটে গিয়ে শিক্ষা নেওয়া এই বয়সের শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও নয়। আর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূলও নয়। এতে এদের দূর পাল্লার হাঁটার অভ্যাস হতে পারে, কিন্তু তারপর শিক্ষার কাজ এরা ক্লান্ত শরীরে কমই করতে পারবে। অন্যদিকে অধিকাংশ গ্রামের প্রত্যেকটি ১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়ে ছাত্রাবাসে থেকে শিক্ষা নেবে এমন ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সুতরাং যদি ১১+এর পর সহশিক্ষা অবাঞ্ছনীয় বলে সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে আমাদের দেশের প্রায় সব মেয়েকেই ৫ম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করার পরই শিক্ষার পাট চুকিয়ে দিতে হবে। কারণ গ্রামে শুধু মেয়েদের

* "বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংগঠন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জন্য আলাদা করে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকবে এ অসম্ভব বলেই মনে হয়।

স্নুতরাং আপত্তিকারীদের যুক্তিগুলি ভাল করে বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

যে সব কারণে ১১ বৎসরের পর সহশিক্ষার আপত্তি করা হয়, তার মধ্যে কিশোরকিশোরীদের একত্র মেলামেশার মধ্য দিয়ে নৈতিক স্খলনের ভয়ই প্রধান। ফুটোনোন্মুখ যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে ছেলে-মেয়েরা একত্র মিশবার স্নুযোগ পেলে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং ফলে তাদের নৈতিক পতন ঘটবে এই আশঙ্কা করা হয়ে থাকে।

এই আশঙ্কার মূলে কোন যুক্তি বা তথ্য আছে বলে আমার মনে হয় না। ভালবাসাকে বিয়ে এবং বিয়েকে সন্তান-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে এক অদ্ভূত ও হীন ধারণার সৃষ্টি করে বসেছি। নরনারীর মধ্যে আকর্ষণের একমাত্র কারণ যৌন কামনা ও তার একমাত্র পরিতৃপ্তি যৌন মিলনে—এ মনে করার কি যুক্তি আছে, জানিনা। 'ভালবাসা' কথাটাকে এই অবমাননাকর অর্থ থেকে মুক্তি দেবার একান্ত প্রয়োজন আছে। ভালবাসা শাণিত খড়্গের মত একটি শক্তির আধার, একে সৎ বা অসৎ পথে পরিচালনা করার ওপর তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে। মানুষের আকর্ষণের মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। এ আজ আমাদের স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ এই ভালবাসা মনুষ্যত্ব-গঠনের মহত্তম উপাদান ; এরই মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের মধ্যে বিশ্ব সত্ত্বাকে উপলব্ধি করার পথ খুঁজে পায়। ভালবাসা

আমাদের মনুষ্য সত্বার একটি মৌলিক উপাদান; জীবনের একটি পরমশক্তির উৎস। দৈহিক ও মানসিক গঠন ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ বিভিন্ন পথে চরিতার্থতা খোঁজে। জগতের প্রতিটি অণু প্রতিটি অণুকে আকর্ষণ করছে, এর কেবল একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয় বলে আমার ধারণা।

চিকিৎসা শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আজ জানি যে, মানুষের এই তথাকথিত কাম-প্রবৃত্তি জন্ম-মুহূর্ত থেকে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। মা ও শিশুর আকর্ষণের মূলেও এই শক্তির ক্রিয়া রয়েছে। যে মা নিজের স্তন-সৌন্দর্যকে নিখুঁত রাখার জন্য শিশুকে ধাইমার হাতে সঁপে দেন, সেই মাকে আমরা প্রশংসা করি না। এই আত্ম-কেন্দ্রিক, শিশুর প্রতি আকর্ষণহীন মনোভাব আমাদের বিরূপ সমালোচনারই বিষয়বস্তু হয়। অন্যদিকে শিশু অজ্ঞাত আকর্ষণে মায়ের পাশে ঘেঁসে আসে, স্তনাগ্রভাগ মুখে তুলে নেয়। এতে তার যে দৈহিক আনন্দ হয়, তার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। যে পিযুষ-ধারা জীবনকে সম্ভব করে, পরিপুষ্ট করে, তা আনন্দকর হবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে।

আনন্দাৎ খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি ॥

আনন্দকে আমরা সকলেই কামনা করি। এ কামনার ধারা শৈশবের স্বকাম পর্যায় ছাড়িয়ে বাল্যের সমকাম পর্যায়ে এসে পৌঁছে। শৈশব যেমন কেটে যায় নিজের পরিচয় পেতে, নিজের মধ্যে অফুরন্ত বিস্ময়ের ভাণ্ডার হাতড়ে হাতড়ে, তেমনি বাল্যকাল অতি-বাহিত হয় সমধর্মীদের পরিচয় নিতে নিতে। তাই আমরা শিশুকে

দেখি আত্মমগ্ন। নিজেকে দেখে দেখে তার তৃপ্তি নেই, নিজের প্রেমেই নিজে মশগুল। এ মানুষের পশুত্বের স্তর। তারপর ৪।৫ বছর থেকে ১১।১২ বছর পর্যন্ত ছেলেরা ছেলেরা দল বাঁধে, আর মেয়েরা মেয়েরা। এ সময়টা ছেলেরা তাদের শক্তি, ক্রীড়াকৌশল, সাহসিকতা ইত্যাদি নিয়েই খুশী, আর মেয়েরা তাদের মেয়েলিপনা নিয়ে। বীরপূজাই হচ্ছে জীবনের এই বয়সটার ধর্ম। ছেলেরা অনুকরণ করে তাদের যাদের তারা আদর্শ মনে করে, উত্তর জীবনে তারা যাদের মত হতে চায়; মেয়েরাও তাই। এ বয়সটার ছেলেরা তাই ভালবাসে পুরুষের সঙ্গ, আর মেয়েরা মেয়েদের; যাদের তারা আদর্শ বলে ভাবে, তাদের একটুখানি সেবা করে কী সুখ, কী তৃপ্তি, তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি, একটু মিষ্টি হাসিতে কী চরিতার্থতা!

যৌবনে নরনারীর আকর্ষণ এই প্রাণধর্মেরই পরবর্তী পরিণতি। প্রকৃতির নিয়মেই এই বয়সে পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বয়সে এই আকর্ষণ সৃষ্ট না হওয়া স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। মনঃ-সমীক্ষণ শাস্ত্রের সংগৃহীত তথ্যের ফলে আজ আমরা জানি যে, যদি কামশক্তির ক্রম-পরিণতি কোন একটা পর্যায়ে এসে রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে নানা মানসিক বিশৃঙ্খলা ও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শৈশবের আত্মপ্রেম একদিন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হবে, নিজেকে নিয়ে তুষ্ট থাকার বদলে বিশ্বের মধ্যে আত্মোপলব্ধি ঘটবে, এইটেই মানুষের বিকাশের পথ, এই তার ধর্ম। সুতরাং যদি কৈশোরের সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে এসেও নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে না ওঠে, তবে তাকে রুগ্ন এবং পঙ্গু মনের লক্ষণ বলেই মনে করতে হবে, সুস্থ স্বাভাবিক মনের নয়।

কখনও কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে, শৈশবের আত্মপ্রেম একেবারে বিশ্বপ্রেমে বা ভগবৎ প্রেমে পরিণত হয়েছে, মাঝের ধাপগুলি একেবারে ডিঙ্গিয়ে গেছে। এটাও স্বাভাবিক নয়। জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে কেউ কেউ হয়ত এমন সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, আজকের জগতে একেও স্বাভাবিক বলা চলে না।

সুতরাং যৌবনের নরনারীর আকর্ষণকে আমরা মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের একটা সোপানরূপে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই পারস্পরিক আকর্ষণের একমাত্র ফল যদি যৌনমিলন হয়, তবে বুঝতে হবে মানুষ এখনও পশুত্বের পর্যায়েই রয়েছে। বিশেষ বয়সের পর বিশেষ বিশেষ ঋতুতে পশুরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কামপীড়িত হয়ে পড়ে ; সে চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে যৌন সম্মেলনে ও সন্তান-উৎপাদনে। মানুষের নিয়তিও যদি এই-ই হয়, মানুষের যৌবন-চাঞ্চল্যের পরিণতিও যদি ওই একই হয়, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ রইল কোথায়? তাহলে দীর্ঘ শৈশব ও বাল্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠতর জীব ক'রে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সার্থকতা কোথায়? মানুষের ভালবাসার পরিতৃপ্তি তার জৈব পরিণতিতে নয়, তার আত্মিক বিকাশে। এইখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—হয় এর অর্থ ভাল ক'রে বোঝার প্রয়োজন আছে, নয় একে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলার সময় এসেছে। স্ত্রী কামনা-পরিতৃপ্তির উপাদান মাত্র নয়, মানুষের পক্ষে পুত্র-উৎপাদন আর পশুর শাবক-উৎপাদন এক জিনিষ নয়, এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভালবাসাকে বিয়ে এবং বিয়েকে

দেখি আত্মমগ্ন। নিজেকে দেখে দেখে তার তৃপ্তি নেই, নিজের প্রেমেই নিজে মশগুল। এ মানুষের পশুত্বের স্তর। তারপর ৪।৫ বছর থেকে ১১।১২ বছর পর্যন্ত ছেলেরা ছেলেরা দল বাঁধে, আর মেয়েরা মেয়েরা। এ সময়টা ছেলেরা তাদের শক্তি, ক্রীড়াকৌশল, সাহসিকতা ইত্যাদি নিয়েই খুশী, আর মেয়েরা তাদের মেয়েলিপনা নিয়ে। বীরপূজাই হচ্ছে জীবনের এই বয়সটার ধর্ম। ছেলেরা অনুকরণ করে তাদের যাদের তারা আদর্শ মনে করে, উত্তর জীবনে তারা যাদের মত হতে চায়; মেয়েরাও তাই। এ বয়সটার ছেলেরা তাই ভালবাসে পুরুষের সঙ্গ, আর মেয়েরা মেয়েদের; যাদের তারা আদর্শ বলে ভাবে, তাদের একটুখানি সেবা করে কী সুখ, কী তৃপ্তি, তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি, একটু মিষ্টি হাসিতে কী চরিতার্থতা!

যৌবনে নরনারীর আকর্ষণ এই প্রাণধর্মেরই পরবর্তী পরিণতি। প্রকৃতির নিয়মেই এই বয়সে পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই বয়সে এই আকর্ষণ সৃষ্ট না হওয়া স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। মনঃ-সমীক্ষণ শাস্ত্রের সংগৃহীত তথ্যের ফলে আজ আমরা জানি যে, যদি কামশক্তির ক্রম-পরিণতি কোন একটা পর্যায়ে এসে রুদ্ধ হয়ে যায়, তবে নানা মানসিক বিশৃঙ্খলা ও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শৈশবের আত্মপ্রেম একদিন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হবে, নিজেকে নিয়ে তুষ্ট থাকার বদলে বিশ্বের মধ্যে আত্মোপলব্ধি ঘটবে, এইটেই মানুষের বিকাশের পথ, এই তার ধর্ম। সুতরাং যদি কৈশোরের সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে এসেও নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে না ওঠে, তবে তাকে রুগ্ন এবং পঙ্গু মনের লক্ষণ বলেই মনে করতে হবে, সুস্থ স্বাভাবিক মনের নয়।

কখনও কদাচিৎ এমনও দেখা যায় যে, শৈশবের আত্মপ্রেম একেবারে বিশ্বপ্রেমে বা ভগবৎ প্রেমে পরিণত হয়েছে, মাঝের ধাপগুলি একেবারে ডিঙ্গিয়ে গেছে। এটাও স্বাভাবিক নয়। জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে কেউ কেউ হয়ত এমন সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, আজকের জগতে একেও স্বাভাবিক বলা চলে না।

সুতরাং যৌবনের নরনারীর আকর্ষণকে আমরা মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের একটা সোপানরূপে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই পারস্পরিক আকর্ষণের একমাত্র ফল যদি যৌনমিলন হয়, তবে বুঝতে হবে মানুষ এখনও পশুত্বের পর্যায়েই রয়েছে। বিশেষ বয়সের পর বিশেষ বিশেষ ঋতুতে পশুরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কামপীড়িত হয়ে পড়ে; সে চাঞ্চল্যের অবসান ঘটে যৌন সম্মেলনে ও সন্তান-উৎপাদনে। মানুষের নিয়তিও যদি এই-ই হয়, মানুষের যৌবন-চাঞ্চল্যের পরিণতিও যদি ওই একই হয়, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ রইল কোথায়? তাহলে দীর্ঘ শৈশব ও বাল্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠতর জীব ক'রে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সার্থকতা কোথায়? মানুষের ভালবাসার পরিতৃপ্তি তার জৈব পরিণতিতে নয়, তার আত্মিক বিকাশে। এইখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'—হয় এর অর্থ ভাল ক'রে বোঝার প্রয়োজন আছে, নয় একে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলার সময় এসেছে। স্ত্রী কামনা-পরিতৃপ্তির উপাদান মাত্র নয়, মানুষের পক্ষে পুত্র-উৎপাদন আর পশুর শাবক-উৎপাদন এক জিনিষ নয়, এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভালবাসাকে বিয়ে এবং বিয়েকে

যৌন-লালসা-তৃপ্তির পথ বলে মনে করে আমরা যে আত্মাবমাননা করছি তা থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। একান্ত অজানাকে আপন করে নেবার মধ্যেই প্রেমের সার্থকতা, বিয়ে তাই ভালবাসার—বিনা প্রতিদানের আশায় আত্মদানের— পথ-প্রদর্শক।

ভালবাসাকে যদি আমরা এই দৃষ্টিতে দেখি, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি আমরা মানুষের মনে ভালবাসার এই অর্থকে সঞ্চারিত করতে চাই, তবে কিশোরকিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণে আমাদের ভীত হবার কিছু নেই। ভালবাসাকে আমরা পাপ বলে ছাপ দিয়ে দিয়েছি বলেই ভালবাসা আজ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে চলে ; কিশোরকিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রতি আমরা ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি বলেই তারা আড়াল খুঁজে প্রধানদের দৃষ্টি এড়িয়ে বেড়ায়। পুলিসী শাসনে এই বয়সের ভালবাসার জোয়ারের স্রোতকে আটকে রাখা অসম্ভব। শাসন যেখানে কড়া, সেখানে ভালবাসা সহজেই পঙ্কিল হয় এবং পদস্খলনের দৃষ্টান্ত সেখানে সুপ্রচুর। বিশ্বভারতীর সহজ সরল আবহাওয়ায় দেখেছি ভালবাসায় ব্যভিচারের প্রকোপ বড়ো কম। কিশোর-কিশোরীদের পারস্পরিক আকর্ষণকে আমরা বিদ্রূপ করতে অভ্যস্ত, এমনকি তাদের সমবয়সীরা পর্যন্ত একে কুৎসিত রহস্যের বিষয়বস্তু করে তোলে, তাদের সামাজিক আবহাওয়ার ফলে। তাই পার-স্পরিক আকর্ষণকে লুকিয়ে রাখতেই আমরা প্রথমাবধি অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এই গোপনতাকে অবলম্বন করেই নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। সমাজে নরনারীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে

রাখা সম্ভবও নয়, আর বাঞ্ছনীয়ও নয়। সমাজে নারী-পুরুষকে কাজ করতে হয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ; সমগ্র কিশোর বয়সে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে হঠাৎ সমাজে তাদের একত্র করে দেওয়া কখনও মঙ্গলকর হতে পারে না, তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার পক্ষে সুফল-দায়ক হতে পারে না। অপরপক্ষে প্রথম যৌবনের এই পারস্পরিক আকর্ষণকে যদি আমরা সম্মানের চোখে দেখি, তবে এই আকর্ষণকেই আত্মোন্নতির সোপান করে তোলা সম্ভব। যাকে ভালবাসা যায়, তার চোখে কোন রকমে ছোট না হবার চেষ্টা করে সবাই। যদি অন্যায় করা, সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, নীচতা বা কদর্যতাতে অভ্যস্ত হওয়া, গোপনতা ভালবাসার দৃষ্টিতে অসম্মানজনক বলে প্রথম থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে ভালবাসা মানুষকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই সহায়তা করবে। বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার কাজ, খেলাধূলা, মেলামেশার ভিতর দিয়ে প্রাকৃতিক আকর্ষণ একটা সুন্দর মনুষ্যোচিত পরিতৃপ্তি পাবে। নরনারীর মধ্যে আকর্ষণ যে কেবল জৈব আকর্ষণ নয়, তা যে নির্মল বন্ধুত্বও হতে পারে, এই বোধ জাগবে আমাদের মধ্যে।

তথ্যের দিক থেকে দেখতে গেলেও এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। নৈতিক স্খলন থেকে কিশোরকিশোরীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই সহশিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্ম। শুধু ছেলেদের বা শুধু মেয়েদের বিদ্যালয়ে সমকাম পর্যায়ের একটা স্থায়িত্ব এসে যায় ; এর ফলে নানা অবাঞ্ছিত, অস্বাভাবিক ও কদর্য যৌন অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক যৌন বিকাশ সেখানে হতে পারে না বলে, অথবা সুস্থ পরিতৃপ্তির কোন পথই সেখানে খোলা থাকে না বলে ঐ রকম বিদ্যালয়ে যৌন

জাগৃতি এবং বিকৃতি অত্যন্ত বেশী রকম হয়। সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রশংসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সুস্থ পরিতৃপ্তির পথ খোলা থাকে বলে যৌন প্রক্ষোভের বাঁধ ভেঙ্গে বিপথে চলার প্রয়োজন পড়ে না। এই বয়সের পারস্পরিক আকর্ষণ বিপদের কারণ হতে পারে না এমন কথা বলা মূর্খতা। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে জোর করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান—এ মতটা অশ্রদ্ধেয়। লুকাবার যেখানে প্রয়োজন নেই, শোধরান সেখানে সহজ। ইংলণ্ডে এই বয়সের শিক্ষার্থীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে পড়ে। তাদের দেশের চাইতে আমাদের দেশে এই বয়সের কিশোরকিশোরীদের মধ্যে নৈতিক স্খলন কম, একথা মনে করার কোন কারণই নেই। যে-কোন একটি দেশের শুধু মেয়েদের বা শুধু ছেলেদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহশিক্ষা বিদ্যালয়ের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, সহশিক্ষা বিদ্যালয়ের নৈতিক আবহাওয়া অনেক স্বচ্ছ। সুতরাং কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে নৈতিক স্খলনকে রোধ করার জন্য সহশিক্ষা অবাঞ্ছনীয় তো নয়ই, বরং একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নৈতিক স্খলনের কারণ সহশিক্ষার মধ্যে নাই ; আছে আমরা যে শিক্ষা ও সমাজ-জীবন থেকে নীতিকে বাদ দিয়েছি তারই মধ্যে। ভোগের ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত, সেখানে কামনার যূপকাষ্ঠে সংযমকে বলি দেওয়াই স্বাভাবিক। যে অন্যকে শোষণ করে নিজের ভোগের উপাদান বাড়াতে পারে, তাকেই আমরা মর্যাদা দিই, বড়লোক বলি, সমাজের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করি। যে নিজে আত্মদান করে, সমাজের মঙ্গল বিধান করে, তাকে বলি বোকা, মূর্খ, ছোটলোক। যার ভোগের উপাদানের পরিমাণ যথেষ্ট নয় সে নিজকে

বঞ্চিত, হতভাগ্য বলে মনে করে, কামনা করে শোষণস্ফীত পরোপজীবী লোকটির মত একজন 'বড় লোক' হবার। সমাজে ভোগের এই মর্যাদার মধ্যেই নৈতিক স্খলনের ভ্রূণ লুকিয়ে থাকে। পরকে শোষণ করে, পরের শ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে বিত্তসঞ্চয় করা যদি দোষণীয় না হয়, পরোপজীবী হয়ে থাকাকে যদি আমরা সম্মান ও আনন্দের ব্যাপার বলে মনে করি, তবে দৈহিক সম্ভোগের লোভে আমাদের রসনা সিক্ত হবে না কেন? আমাদের চিত্তকে এই নৈতিক স্খলন থেকে রক্ষা করতে গেলে নারীর সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়াই তার সমাধান নয়।

ঈশবাস্যসর্বমিদং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

এই মন্ত্রটিকে আত্মস্থ করা, সংযমের দ্বারা ভোগকে বিশুদ্ধ করে নেওয়াই একমাত্র পথ।

প্রথম সমস্যার এই সমাধান যদি আমরা স্বীকার করে নিই, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যার সমাধান খুবই সহজ হয়ে পড়ে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে নরনারীর ভূমিকা যে ভিন্ন, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নেই। জীবনে বৃত্তির দিক থেকে নারীরা আজ অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন। কঠিন যান্ত্রিক নৈপুণ্যের কাজে, এমন কি প্রচুর গায়ের জোরের কাজেও, মেয়েরা আজকাল এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এ অবস্থা যে বাঞ্ছনীয় নয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্পই আছে। মেয়েদের দেহ এমনি ভাবেই গড়া যে, সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা তাঁদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আর তাছাড়া সন্তান-উৎপাদন ও পালনের কাজে

তাঁকে এমন অংশ গ্রহণ করতে হয়, যার ফলে তাঁকে অনেকখানি সময় গৃহে কাটাতে হয়। শিশুকে শিশুভবনে ছেড়ে দিয়ে কাজ করার রেওয়াজ আজকাল কোথাও কোথাও হয়েছে। কিন্তু তা খুব বাঞ্ছনীয় এবং গ্রহণযোগ্য বলে এখনও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নি।

অবশ্য আমাদের দেশে আমরা যে ভাবে স্ত্রী-পুরুষের কাজ ভাগ করেছি, তা কোনদিন সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। পুরুষের প্রাধান্যযুক্ত একটা সমাজে মেয়েদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা মেয়েদের গৃহলক্ষ্মী, কল্যাণী ইত্যাদি গালভরা বুলিতে ভুলিয়ে দাসী করে রেখেছি। মেয়েরা একদিন সত্যই আমাদের দেশে সম্মানিতা কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী ছিলেন না এমন কথা বলছি না। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে আজ আমরা তাঁদের পক্ষে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠাকে অসম্ভব করে তুলেছি। গৃহকোণেই যাঁদের বিশ্বসংসার, বাইরের খবর যাঁরা এতটুকু রাখেন না, অতি যত্নে যে খাদ্যটুকু তাঁরা প্রিয় পরিজনদের হাতে তুলে দেন, তার গুণাগুণ যাঁদের অজ্ঞাত, যে শিশুকে বুকে জড়িয়ে তাঁরা সকল দুঃখ-দৈন্য ভুলে থাকতে চান, তার মঙ্গলামঙ্গল যাঁদের অজানা, তাকে সুস্থ-সবল মানুষ করে গড়ে তোলার পথের খবর যাঁরা জানেন না, তাঁদের পক্ষে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী হওয়া সম্ভব হবে কি করে? সুতরাং আজ যখন কলাণী গৃহলক্ষ্মীকে অন্ধকার কার্বনডাই-অক্সাইডপূর্ণ রান্না ঘরে সারাদিন ফেলে পুরুষরা হাওয়া খেতে বেরোন, অথবা বাড়ীর সবচেয়ে নোংরা অন্ধকার ঘরটিকে আঁতুড় ঘর করে অন্যেরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান, তখন অজ্ঞ নারীর

অশিক্ষার সাগরকে মন্থন করে সংসারে হলাহলই জমতে থাকে মাত্র।

পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে দৈহিক কোমলতা ও অন্তরের মাধুর্য যে বেশী আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখতে পাই না। সুতরাং ন্যায়ের ভিত্তিতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে কার্যবিভাগ হবে, তাতে এই কথাগুলি ভাল করে মনে রাখা দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের কাজে দক্ষ মেয়ে দেখা যায় না তা নয়, কিন্তু তাকে ব্যতিক্রমই বলা চলে, সাধারণ নিয়ম নয়। সুতরাং নরনারীর কার্যবিভাগ করতে গিয়ে একদিকে যেমন সাধারণ নিয়মটির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি ব্যতিক্রম যারা, তাদেরও বিকাশের সুযোগ তৈরী করে রাখতে হবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা হলে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করি। সহশিক্ষা বিদ্যালয়ের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকে সকল কাজ একসঙ্গে একই ভাবে করবে।

কোন কোন কাজ মেয়ে বা ছেলেদের পক্ষে বিশেষ যোগ্য হলেও সাধারণতঃ জীবনের মূলকাজগুলিতে স্ত্রীপুরুষ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হয়। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও শিশুকে লালন করা একান্তভাবে মেয়েদের কাজ হলেও রান্না করা বা বাসন-মাজার কাজ একান্তভাবে মেয়েদের নয়। জগতে শ্রেষ্ঠ পাচকরা সাধারণতঃ পুরুষ। রান্না করা বা বাসন মাজা কাজে যে গায়ের জোরের প্রয়োজন তা বিশেষভাবে পুরুষেরই আছে। আবার লাঙ্গলচালনার মত কাজ প্রধানতঃ পুরুষের হলেও ধান্য-বপন, শস্য-কর্তন, এগুলি মেয়েদেরই

কাজ। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে পুরুষ ও নারীকে আলাদা-ভাবে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন থাকলেও প্রধানতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কাজগুলিকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হবে, তাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা সত্যসত্যই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গড়ে উঠতে পারে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়; কারণ, কোন শাস্তি না দিয়ে কাজ ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের যে আদর্শ, এতে যে সংযম ও তন্ময়তার প্রয়োজন তা পুরুষের চাইতে মেয়েদের বেশী থাকার কথা। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ শিশু শ্রেণীগুলির জন্য শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে, এটা আমরা আশা করতে পারি। অতএব মেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষা যেটুকু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা এঁদের মধ্য দিয়েই হতে পারবে। সুতরাং মেয়েদের তাদের জীবনের জন্য গড়ে তুলতে তাদের আলাদা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে, একথা মনে করি না।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবশ্য-করণীয়রূপে যে কাজগুলি গ্রহণ করা হয়, তা এই: (১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার কাজ, (২) খাদ্য ও বস্ত্র উৎপাদনের কাজ, (৩) যন্ত্রপাতি ও আবাস নির্মাণ সম্পর্কিত প্রাথমিক কাজ, (৪) উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানের কাজ। এসবের প্রত্যেকটি কাজে পুরুষদের ও মেয়েদের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। শুধু মেয়েদের বা শুধু ছেলেদের বিদ্যালয় হলে একাজগুলি সুষ্ঠুভাবে বাইরের সাহায্য না নিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না। খাদ্য-উৎপাদনের কাজে মেয়েদের বিদ্যালয়ের মাঠে

লাঙ্গল চালাবার জন্য বাহির থেকে মজুর আমদানী করতে হবে; আবার ছেলেদের বিদ্যালয়ে কৃষিকাজের জন্য ঘাস-বাছার মত কাজ ছেলেরা করলে অনেকখানি শক্তির অপচয় ও উৎপাদন ব্যাহত হবে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি কাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি কাজই সকলের করণীয়। কিন্তু শুধু মেয়েরা বা শুধু ছেলেরা যদি কাজগুলি করতে যায়, তবে হয় কাজগুলি সুসম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, নয়তো কাজগুলি করতে গিয়ে অনেকখানি শক্তির অযথা অপচয় হবে।

শিক্ষা-দান পদ্ধতির দিক থেকে তৃতীয় আপত্তিটির ওপর খুব জোর দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম যৌবনোদগমের সময় যে মনের বিকাশ অতি দ্রুত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই যৌবনোদগম মেয়েদের বেলায় ছেলেদের চাইতে একটু আগে হয়। ফলে, কম বয়সে মেয়েরা ছেলেদের চাইতে এগিয়ে যায়। যেখানে পুঁথি ও বক্তৃতা শিক্ষা দানের মাধ্যম, সেখানে এই সমবয়স্ক অসমবুদ্ধি কিশোর-কিশোরীদের একসঙ্গে পাঠদান সত্যই একটি বড় রকমের সমস্যা। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এ সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা নয়, কারণ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম পুঁথি এবং বক্তৃতা নয়—কাজ। যখন শিক্ষক বক্তৃতা করেন এবং ছাত্রছাত্রীরা তাই গলাধঃকরণ করে, তখন সমগ্র শ্রেণীর জন্য উপযোগী একটা আজব চিজ পরিবেশন করা ছাড়া উপায় থাকে না। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ সেটাকে গ্রহণ করতে পারে, কারও পক্ষে সেটা হয় একান্ত গুরুপাক, আবার কারও ক্ষুধার বিন্দুমাত্র তৃপ্তি হয় না তাতে। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এ রকম সার্বজনীন

দ্রব্য পরিবেশ করার প্রয়োজন শিক্ষকের হয় না। প্রত্যেক বিদ্যার্থী কাজ করে নিজের শক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী, শিক্ষক তার সহায়ক, উপদেষ্টা মাত্র। ফলে প্রত্যেকে কাজ করে তার শক্তি অনুযায়ী, গ্রহণ করে তার যোগ্যতা অনুযায়ী, আত্মস্থ করে তার শক্তি অনুযায়ী। এখানে শ্রেণীটা প্রধান নয় ; এক শ্রেণীতে অসমবয়স্ক অসমবুদ্ধি বালকবালিকা থাকিলে অসুবিধার কোন কারণ নেই ; বাড়ীতে সব শিশু একসঙ্গে জন্মায় না, সকলের বয়স এক থাকে না ; কিন্তু ভাল মায়েরা তাদের সকলকে সুশিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবিধা এইখানেই। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে মনোযোগ দেবেন, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন, এইটেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মূলকথা। প্রত্যেককে প্রত্যেকটি কথা শিক্ষককে বলতে হবে তা নয়। বিদ্যার্থীরা পরস্পরকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করবে ; যে এগিয়ে আছে, সে পশ্চাৎবর্তীকে সাহায্য করবে। এরই মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সামাজিক কর্তব্যের জ্ঞান গড়ে ওঠে। অন্যকে বুঝিয়ে দেবার, শিক্ষা দেবার যোগ্যতা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি পরীক্ষা। যেখানে একে অন্যকে বুঝিয়ে দিতে পারে না, সেখানেই শিক্ষক এগিয়ে আসবেন। সুতরাং অসমবয়স বা অসমবুদ্ধি বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্তরায় হতে পারে না। তবে স্বভাবতঃই যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে একজন শিক্ষক অগণিত ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব নিতে পারেন না। সুতরাং ২৫ থেকে ৩০জন ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব যদি একজন শিক্ষক নেন, তবে শিক্ষার্থীরা অসমবয়স্ক, বয়স্ক

বা অসমবুদ্ধি বলে তাঁর কোনো বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

সুতরাং যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য কাজগুলির হাল্কা অংশটুকু সকলে মিলে একসঙ্গে করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কোন কোন বিশেষ শিক্ষা আলাদাভাবে গ্রহণ করলেও মূল কাজগুলি একত্রে পরস্পরের পরিপূরকরূপে করে, তবে তাদের শিক্ষা সার্থক সমাজে বাঞ্ছিত রূপান্তর আনবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটি

অনেক সহকর্মী চিঠি লিখেছেন 'বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটির কোন তালিকা যদি আপনার কাছে থাকে তবে তা পাঠিয়ে দেবেন।' অনেকে জানতে চেয়েছেন: 'পূজার ছুটি কদিন দেওয়া উচিত হবে বলে মনে করেন জানাবেন।' মোটকথা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটির প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মনে দ্বিধা আছে, এবিষয়ে কি করা উচিত, কি নীতি অনুসারে চলা উচিত, এ আমরা ঠিক করে উঠতে পারছি না। এজন্য এই সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ছুটির সাধারণ তালিকা তো তাঁদের সামনেই রয়েছে, তবে সহকর্মীদের এই প্রশ্নের কারণ কি? এথেকে স্বভাবতই মনে হয় যে, সাধারণ ছুটি যেভাবে দেওয়া হয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পক্ষে তা উপযোগী বলে তাঁরা মনে করেন না। এই মনে করার কারণ কি?

আমার ধারণা, দুদিক থেকে এ-রকম মনে হওয়ার কারণ আছে। প্রথম কারণ, সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মৌলিক আদর্শগত তফাৎ; দ্বিতীয়তঃ, ছুটির প্রয়োজন ও স্বরূপ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা। আমরা একে একে এই দুটি কারণকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

(১) সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে মূলগত পার্থক্য কোথায়?

প্রথমতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আদর্শ কেবলমাত্র জ্ঞানদান নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে লক্ষ্য থাকে শিশুর চরিত্রকে গড়ে তোলার;

তার শিক্ষার ঝুলিই শুধু ভরে দেওয়া নয়, তার আচরণকেও শিক্ষার অনুগামী করে তোলার। এর ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের চারিটি দেয়ালের মধ্যেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে না, কাজ আরও ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুর আচরণ ও তার চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যালয়ের কোন দায়িত্ব নেই, সে দায়িত্ব এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই শিশুর অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। শিশুর চোখে চশমা উঠলে, তার পৃষ্ঠ কুব্জ হতে থাকলে, তার সর্ব-দেহ খোস-পাঁচড়ায় ভরে গেলে শিক্ষক ভাবতে বসেন না; তাঁর কাজ সময়মত পাঠ দেওয়া, যথা সময়ে শিশুর বিদ্যার পরীক্ষা করা। বিদ্যালয়ে শিশু যতক্ষণ থাকে কেবলমাত্র ততটুকু সময়ের জন্যই শিক্ষকের দায়িত্ব, এর পরে শিশু কি করে না-করে তার জন্য কেউ তাঁকে দায়ী করতেও আসে না, আর তিনি নিজেও সেজন্য নিজকে দায়ী মনে করেন না। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অবস্থা অন্য রকম। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুর যে অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, যে শিক্ষা শিশুকে দেওয়া হয়, তার বিপরীত কিছু যদি শিশু করতে থাকে তবে সেখানে শিক্ষককে ভাবতে হয় যে, তাঁর শিক্ষাদানে কোথায় দুর্বলতা রয়েছে? অভ্যাস গড়ে তুলতে গেলে চোখ বুজে পাঠ দেওয়া চলে না, কু-অভ্যাস বদলাবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়; সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় কিভাবে অভ্যাস গড়ে উঠছে, কি করে তা আদর্শপথে পরিচালিত করা যেতে পারে। সুতরাং, বিদ্যালয়গৃহের সীমা ও সময়ের বাইরেও কাজ করা ছাড়া শিক্ষকের উপায় থাকে না। শিশুর ঘরের খোঁজ রাখতে হয়, শিশুর বাপ-মাকে অনুরোধ জানাতে হয়, উপদেশ দিতে হয়; নিজেই কখন ডাক্তার

সাজতে হয়, কখনও ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রতি মুহূর্তে শিশুর চরিত্র গড়ে উঠছে, তার অভ্যাস তৈরী হচ্চে। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষককে যথাসম্ভব সর্বদা শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়; কারণ, অভ্যাস শিক্ষকের অসাবধানতায় একবার গড়ে উঠলে শিক্ষককেই আবার তার জন্য ভুগতে হবে। শিক্ষার ব্যাপকতা সমগ্র জীবনের সমান ও জীবিত থাকতে জীবনের কাজ কখন বন্ধ হয় না। এজন্য এখানে শিক্ষকের কর্তব্যের ব্যাপকতা অসীম।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয় গ্রাম-সমাজেরই একটা অঙ্গ। এযেন অনেকটা বৈঠকখানা বা বারোয়ারীতলার মত। শিশুরা এখানে আসে বন্দী হবার জন্য নয়; গুরুগম্ভীর শিক্ষা নেবার জন্য নয়; দেহে মনে নিজকে গড়ে তোলার জন্য, নিজের স্বাধীন বিকাশের জন্য। বৈঠকখানা যেমন রবিবারে বন্ধ থাকে না, আরও বেশী করে জমে ওঠে, তেমনি বুনিয়াদী বিদ্যালয়েরও জমার সুযোগই বেশী, বন্ধ হবার সুযোগ কম। বুনিয়াদী বিদ্যালয় কেবলমাত্র শিশুর পড়বার জায়গা নয়, তার কাজের জায়গা, তার খেলারও জায়গা। পড়ায় যেদিন শিথিলতা আসে, সেদিন হয়ত ঝোঁক পড়ে কাজে, নয়ত খেলায়, কিন্তু সবকটা দিক বন্ধ করে দিলে শিশু করবে কি সারাদিন! সুতরাং এই হিসাবেও সাধারণ বিদ্যালয়ের চাইতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমস্যা আলাদা। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশু যায় পাঠ নিতে। রোজ রোজ পাঠ নেওয়া দেওয়া এটাই একঘেয়ে। বিদ্যালয় বন্ধ করে সবাইকে ছুটি দিলে শিক্ষক শিশু সবারই জীবনে বৈচিত্র্য আসে, রোজকার একঘেয়ে কর্মসূচী ছেড়ে তাঁরা যাহোক

একটু অন্য কিছু করবার সুযোগ পান। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এরকম কৃত্রিম বৈচিত্র্যের প্রয়োজন অতি অল্প। বৈচিত্র্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাণ। খেলা, উৎসব, বেড়ান বুনিয়াদী শিক্ষার দৃষ্টিতে এগুলি শিক্ষার অঙ্গ। এজন্য অনুরূপ প্রতিটি কাজের জন্য শিক্ষককে সযত্নে পরিকল্পনা তৈরী করতে হয় এবং নিজের তত্ত্বাবধানে সেগুলিকে কাজে পরিণত করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকমের ফুল, ফল, গাছ, পশু, পাখী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সূচীর অন্তর্গত। এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া দরকার; বনভোজন, বেড়ান, সংগ্রহাগার-সৃষ্টি ইত্যাদি এই শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। এগুলি শিশুর কাছে খেলা বলেই প্রতিভাত হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য শিক্ষা হিসাবে এর মূল্য কমবে না বা শিক্ষকের প্রস্তুতিতে বা সতর্কতায় শিথিলতা এলে চলবে না। বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-স্মৃতি উৎসবের কথা ধরা যাক। সব বিদ্যালয়ই সেদিন থাকে বন্ধ। উৎসবে যোগদান করা না-করা বিদ্যার্থীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই হয়ত সেদিন নাক ডাকিয়ে ঘুমায় বা সিনেমা দেখে কাটায়। সাধারণ ভাষায় ওটা হচ্ছে 'extra academic' ব্যাপার। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিন্তু ওটা সম্পূর্ণ শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যে প্রস্তুতি চলতে থাকে তা অবসর সময়ে হয় না, কয়েকদিনের জন্য ওটাই হয় বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। প্রত্যেককেই এ নিয়ে কিছু-না-কিছু কাজ করতে হয়, কবিতা শোনা, কবিতা লেখা, প্রবন্ধ লেখা, সাজান, গেটবাঁধা, নিমন্ত্রণ করা ইত্যাদি। এগুলি কোনটাই ছুটীর কাজ বলে গণ্য হয় না; প্রত্যেকটি কাজেই শিশুর শিক্ষা,

তার চরিত্র, তার কর্মশক্তি, নিপুণতা, চিন্তাশক্তিকে এগিয়ে নেয়। সুতরাং শিক্ষার সংজ্ঞা সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষার ধারণা ভিন্ন হওয়ায় একটা তফাৎ আপনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(২) এবার বুনিয়াদী শিক্ষার ছুটির স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্পর্কে আমার কি ধারণা, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

সম্পূর্ণ ছুটি বা বিশ্রাম বলে কিছুই আছে কি! কাজ থেকে সম্পূর্ণ ছুটি মানে মৃত্যু। সম্পূর্ণ বিশ্রামের আর একটা দৃষ্টান্ত আছে সুনিদ্রা। কিন্তু ঘুমিয়ে তো দিনের পর দিন কাটান চলে না। ঘুমের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। অসময়ে ঘুমান বা অতিরিক্ত ঘুমান দৈহিক বা মানসিক কোন স্বাস্থ্যের পক্ষেই কাম্য নয়। ৫।৬ বৎসর বয়সের পর দিবানিদ্রা থেকে মুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতিনিদ্রা মানসিক জড়তা ও দৈহিক দৌর্বল্য সৃষ্টি করে।

ছুটির দ্বিতীয় প্রয়োজন হতে পারে ব্যক্তিগত কাজকর্ম সারার জন্য। বর্তমানে বে-সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে ভাবে প্রয়োজনের চাইতেও অনেক কম কর্মীতে কাজ চালিয়ে নিতে হয়, যেভাবে সারাদিন শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কাজ করে যেতে হয়, তাতে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজের স্তূপ জমে উঠতে থাকে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই আদর্শ অবস্থা বা ব্যবস্থা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে শৃঙ্খলা, বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজসৃষ্টির কথা কল্পনা করে তাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিকাশ একসূত্রে বাঁধা পড়বে, তাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান হবে। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষককে তাঁর দৈনিক কর্মসূচী এমন ভাবে তৈরী

করতে হবে যাতে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ তিনি প্রত্যহ সু-সম্পূর্ণ করতে পারেন। অনেক কাজ জমিয়ে তারপর একদিনে ছড়াছড়ি করে তা শেষ করার মধ্যে সুষ্ঠু সম্পাদনার অভাব থাকতে বাধ্য, আর সেটা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের সামনে কু-দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

তাছাড়া ছুটির কথা তো কেবলমাত্র শিক্ষকের দিক থেকে ভাবলেই চলবে না, বিদ্যার্থীদের দিক থেকেও ছুটির ফলাফল ভেবে দেখতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা হবে স্থানীয় বালক-বালিকা। বিদ্যালয়ের ছুটি হলে বাড়ীতেই তাদের ছুটির দিনগুলি যাপন করতে হবে। আমরা মনে করি যে, ন্যূনতম সাত বছরের আগে বিদ্যার্থীরা বুনিয়াদী শিক্ষার নূতন আদর্শকে আত্মস্থ করতে পারে না। সেজন্য অভ্যাস গড়ার মুখে যদি আমরা তাদের দীর্ঘ ছুটি দিয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধান থেকে দূরে সরিয়ে নেই, তাতে তাদের অগ্রগতি তো ব্যাহত হবেই, অনেক অবাঞ্ছিত অভ্যাসও এই সময়ের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে হয়ত শিক্ষকের বহুদিনের শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে ও তাঁকে আবার নূতন করে সুরু করতে হবে।

হয়ত এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হবে এই যে, যদি শিশু সর্বদাই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকে, তাকে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে দেওয়া না হয়, তবে তো বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে স্বাবলম্বী শিশু গড়ে তোলা, ভালমন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করে 'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে' নিজের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে এগিয়ে চলার শিক্ষা দেওয়া। সারা বছর সর্বসময়

যদি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই শিশুকে বাড়তে হয় তবে এইভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ শিশু পাবে কি করে? হয়ত এই তত্ত্বাবধানের ফলে শিশু সু হয়ে গড়ে উঠবে, কিন্তু সেতো হবে যান্ত্রিক কৃতিত্ব।

এই যুক্তিতে যে প্রচুর শক্তি আছে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এখানে ছুইটি কথা প্রধানতঃ চিন্তা করার আছে। প্রথমতঃ, শিশুকাল এমনি একটা বয়স যখন শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এগুতে পারে না। পারিপার্শ্বিক চরিত্র ও কর্মধারা তার জীবনকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। সুতরাং শিক্ষকের প্রভাব বাড়িয়ে নিলেও শিশু স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে না, অন্যের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হবে। সে প্রভাব হবে পিতামাতার প্রভাব, গ্রামের প্রভাব। আজকের দিনে এই প্রভাবের স্বরূপ আমরা জানি। সুতরাং চারা গাছকে যেমন বেড়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে, তেমনি শিশুকেও একটা নূতন আদর্শের জন্য তৈরী করতে হলে তাকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে রাখার প্রয়োজন আছে। শিশু শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকবে একথার মানে এই নয় যে, প্রতিটি কাজে শিক্ষক তাকে পরিচালিত করবেন। শিশুকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া; পরিকল্পনা-রচনা, পরিকল্পনা কাজে পরিণত করায় শিশুকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া বুনিয়াদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষক যদি শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগ না দিয়ে নিজের ছাঁচে গড়ে তোলেন, তবে সে শিক্ষকের অকৃতকার্যতা, তাঁর ত্রুটি, শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষ নয়। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে শিশু বেড়ে উঠবে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা পিতামাতার কাছেই হবে, এ হয়ত আদর্শ হতে পারে, কিন্তু আজকের

গ্রামসমাজ এবং শিক্ষা ও রুচিহীন পিতামাতার সাহচর্য ও শিক্ষায় শিশুর ক্ষতি হবে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয় কেবলমাত্র শিশুর পড়াশুনার স্থান নয়। তার কাজ, খেলাধূলা, আত্ম বিকাশ ও প্রকাশের কেন্দ্রও ওই বিদ্যালয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের সরঞ্জাম, পুস্তক প্রভৃতির সুবিধা সর্বদা পাওয়াও শিশুর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

শিশুর পক্ষে বিদ্যালয়ের সুবিধা এবং শিক্ষকের পরামর্শ ও পরিকল্পনার সুযোগ সর্বদা পাওয়ার প্রয়োজন আছে মেনে নিলেও শিক্ষকের পক্ষে ছুটির প্রয়োজন আছে তা অনস্বীকার্য। প্রথমতঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষককে প্রচুর শরীর-শ্রম করতে হয়। এই শ্রম একঘেয়ে হয়ে ওঠে যদি না বৈচিত্র্যের সুযোগ এতে থাকে, নূতন নূতন শিক্ষা দ্বারা নিপুণতাকে সমৃদ্ধ করে এগিয়ে চলার সুযোগ থাকে। কাজ তখনই বোঝা হয়, যখন তা বৈচিত্র্যহীন হয়ে ওঠে, যখন এর মধ্য দিয়ে কর্মীর সামাজিক বিকাশ সংসাধিতও হয় না। শিশুর কাছে বিদ্যালয়ের কাজ একঘেয়ে হওয়ার কারণ নাই ; কারণ প্রতিদিন এই কাজের মধ্য দিয়ে তার মানসিক বিকাশ হতে থাকে, তার সৃজনী-ক্ষমতার আনন্দ গাঢ়তর হতে থাকে, কাজের বৈচিত্র্যে মন আনন্দে পূর্ণ হতে থাকে। কিন্তু শিক্ষকের দিকে সে সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। শিশুর কাছে যা খেলা, শিক্ষকের কাছে তা কাজ। যদি শিক্ষকের শিক্ষাকে মাঝে মাঝে অগ্রসর করে দেবার, শিক্ষকের অভিজ্ঞতাকে বৈচিত্র্যের স্পর্শ দেবার সুযোগ না থাকে, তবে শিক্ষকের পক্ষে কাজের একঘেয়েমীতে ক্লান্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্তব্যের ব্যাপকতার কথা বলেছি। তার ফলে বিদ্যালয়ের কার্যসূচী অনুযায়ী ২।৪ ঘণ্টা কাজ করেই শিক্ষকের কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না। প্রায় সারাটা দিনই তাঁকে বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করতে বা বিদ্যালয়-সম্পর্কিত কাজ করতে হয়। ফলে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন সমধিক।

তৃতীয়তঃ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ বই ধরে পাঠ দেওয়া নয়। তাঁকে কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দিতে হয়। ফলে কাজটিকে ভাল করে আয়ত্ত করা প্রয়োজন, তাতে শিক্ষণীয় বিষয় কি আছে, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। এজন্য যথেষ্ট পড়াশুনা করা এবং আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ঘুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করা শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

এ সকল যুক্তি স্মরণ রেখে আমরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছুটির কথা ভাবতে পারি। প্রথমতঃ, শিশুর দিক থেকে ছুটির অর্থ হবে বৈচিত্র্য, সে বৈচিত্র্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং একে শিশুর শিক্ষার অঙ্গ বলে গণ্য করা উচিত। অন্যদিকে শিক্ষকের ছুটির প্রয়োজন বিশ্রামের জন্য, আত্মোন্নতির জন্য এবং শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য। একথা বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, শিশুর জন্য বিদ্যালয় সর্বদাই খোলা থাকা উচিত। কাজ, খেলা, বেড়ান, লেখাপড়া,— এই সমস্তই হবে শিক্ষার অঙ্গ, বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। সুতরাং বিদ্যালয়গৃহের মধ্যেই সর্বদা বিদ্যালয়ের কাজ হবে এমন নয়, কিন্তু সর্বপ্রকারে বিচিত্র কার্যসূচীর পিছনে শিক্ষকের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা থাকবে।

সুতরাং শিশুর দিক থেকে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর বৈচিত্র্য অপরিহার্য কিন্তু বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ছুটি বাঞ্ছনীয় নয়।

অন্যদিকে শিক্ষকের জন্য টুকরা টুকরা ছুটির ব্যবস্থা না রেখে একসঙ্গে দীর্ঘ ছুটি হওয়া দরকার। পালা করে একজনের পর আরেকজন ছুটি উপভোগ করবেন এবং সেই সময়ের মধ্যে নিজকে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করে নেবেন। আমার ধারণা বৎসরে একসঙ্গে তিনমাস ছুটি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। শিক্ষকেরা পালা করে ছুটি নিলে বিদ্যালয়ের কাজও কোনরূপ ব্যাহত হবে না, অন্যদিকে শিক্ষক ও বিদ্যালয় এরকম ছুটিদ্বারা প্রকৃত লাভবান হবেন। আমরা আশা করবো যে, ভবিষ্যতে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামেরই লোক হবেন। কিন্তু বর্তমানে অন্ততঃ শিক্ষকরা কেবলমাত্র গ্রাম থেকেই আসেন না। বৎসরে অন্ততঃ একবার তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। একমাস বা ১৫ দিনের ছুটির মধ্যে মিলনের গভীরতা থেকে ছুটাছুটির তাড়াহুড়াই বেশী থাকে। এককালীন দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা হলে এই সমস্যারও সমাধান হবে, তাছাড়া সবগুলি বিদ্যালয় একসঙ্গে বন্ধ থাকলে শিক্ষকদের পক্ষে আদর্শ বিদ্যালয়গুলির কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকে না। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকরা বিভিন্ন বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন। আমাদের মতে, প্রতি দশটি বিদ্যালয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থাকা উচিত। এই রকম এক একটি বিদ্যালয়-গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্ততঃ বৎসরে

একবার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ও শিক্ষাধারা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তা হলে বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জড়পদার্থে পরিণত হবে না, নূতন নূতন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চলবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যসূচীতে দেখতে পাই যে, কাজের জন্য বৎসরে ২০০ দিন নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে কাজের হিসাব করা হয়েছে। যদি সাপ্তাহিক হিসাব করার, বিবরণী ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ৫২ সপ্তাহে ৫২ দিন রীতিমত কাজ হবে না বলে এই হিসাবে ধরা হয়নি বলে ধরে নেই, তবুও বছরে ১১৩ দিন ছুটি বলে গণনা করা হয়েছে দেখতে পাই। বছরে ১১৩ দিন শিশু কি করে কাটাবে? তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেবার অসুবিধার কথা বলেছি। আমার ধারণা, বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলিকেও ছুটির দিন বলে গণনা করা হয়েছে। আমার মতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পক্ষে উৎসবের দিনগুলিকে ছুটির দিন বলে গণ্য করা উচিত হবে না। সেদিনগুলিতে শিশুর খাটুনী ও শিক্ষা অন্যান্য দিনের চাইতে তো নিশ্চয়ই কম হয় না, বরং বেশী হয়। ছুটির দিনে আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বা যাওয়া যেমন বন্ধ থাকে না, তেমন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎসবের দিনে সূতাকাটা বা হিসাব করা বা দিনলিপি লিখা বন্ধ থাকা উচিত নয়। এটা শোষণহীন স্বাবলম্বী সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের একটি অবশ্যকরণীয় ব্রত, অন্নশ্রম। সুতরাং এই দিনগুলিকে ছুটির দিন বলে গণ্য করার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না। বরং এই ধারণার ফলে ক্ষতি হয়; প্রথমতঃ শিক্ষক উৎসবের সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা অনুষ্ঠানে ঢিল

দেন, দ্বিতীয়তঃ এগুলিকে extra academic বলে গণ্য করে শিশুর খেলাধূলা বা বিশ্রামের সময় থেকে সময় কেড়ে নেন। শিশু উৎসবের উৎসাহে আনন্দে কাজ করে বটে কিন্তু তার শারীরিক স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার ক্ষতি হয়। শিক্ষকও উৎসব-উপলক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়কে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয় মনে করে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন না। একজন সহকর্মী তাঁর মাসিক বিবরণীতে একবার আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ঐমাসে উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের প্রস্তুতির জন্য অনেকখানি সময় দিতে হওয়ায় সে মাসে বাংলা সাহিত্যের কাজ কম হয়েছে। এথেকেই বোঝা যাবে যে, উৎসবকে শিক্ষার অঙ্গ বলে গণ্য না করলে আমরা মাঝে মাঝে কি রকম হাস্যকর ভুল করতে পারি।

সমাপ্ত